~~Sr B.T.C.~~

3854

~~347~~

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত
(২০।১।৫৫ তারিখের কলিকাতা গেজেটে ২৭।১২।১৯৫৪ তারিখের সিল/৭৯/'৫৪ নং বিজ্ঞপ্তি দ্রষ্টব্য)

সরল বিজ্ঞান

দ্বিতীয় ভাগ

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক

শ্রীহিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায়

এম. এস-সি. (কলিকাতা), ডি. এস-সি. (লণ্ডন),
ডি. আই. সি. (লণ্ডন), এফ. এন. আই.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত-রসায়নের প্রধান অধ্যাপক

শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহ

এম. এস-সি. (কলিকাতা), পি-এচ. ডি., ডি. এস-সি. (লণ্ডন), এফ. এন. আই.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌-বিদ্যার অধ্যাপক

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এম. এস-সি. (কলিকাতা), পি-এচ. ডি. (এডিনবারা),
এফ. এল. এস. (লণ্ডন)

প্রণীত

বাণীমন্দির

১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ.
১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

চতুর্থ সংস্করণ

মূল্য এক টাকা দুই আনা

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বায়ু (Air)

পৃথিবী বায়ুর দ্বারা পরিবৃত। পৃথিবীর আকর্ষণের জন্য বায়ু পৃথিবী ছাড়িয়া শূন্যে চলিয়া যাইতে পারে না। সেইজন্য পৃথিবী ঘিরিয়া উহা একটি বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে।

বায়ুর উপাদান—বায়ু একটি **মিশ্র পদার্থ**। ইহার মধ্যে যে সকল উপাদান আছে তাহাদের নিজেদের পৃথক্ ধর্ম আছে। বায়ুর বিভিন্ন উপাদানগুলি সহজেই পৃথক্ করা যায়। বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং আর্গন প্রভৃতি গ্যাস আছে। বায়ু মিশ্র পদার্থ বলিয়া ইহার উপাদানগুলির পরিমাণ সকল স্থানে ঠিক সমান থাকে না। যেমন সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানে বায়ুতে অক্সিজেনের অংশ সামান্য কিছু বেশী আবার পাহাড়ের উপরে উহার অংশ একটু কম থাকে। বায়ুর উপাদান গড়ে শতকরা এইরূপ :—

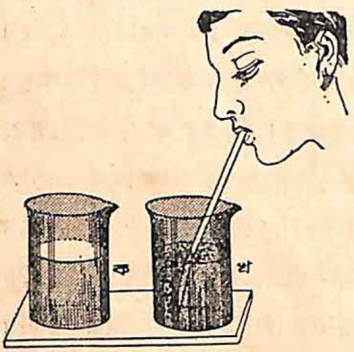
অক্সিজেন	...	২০·৬০ ভাগ	
নাইট্রোজেন	...	৭৭.১৬ ,,	
জলীয় বাষ্প	...	১·৪০ ,,	= ১০০·০০
কার্বন ডাই-অক্সাইড	...	০·০৪ ,,	
আর্গন প্রভৃতি গ্যাস	...	০·৮০ ,,	

ইহা হইতে দেখা যায় যে বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এই দুইটি গ্যাসই হইল প্রধান উপাদান এবং বায়ুর আয়তনের প্রায় $\frac{১}{৫}$ অংশ অক্সিজেন এবং $\frac{৪}{৫}$ অংশ নাইট্রোজেন ও অন্যান্য গ্যাস।

বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও আর্গন প্রভৃতি গ্যাস **মৌলিক পদার্থ** এবং জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই-অক্সাইড **যৌগিক**

পদার্থ। মৌলিক পদার্থ বিশ্লেষণ করিলে তাহা হইতে অন্য কোন পদার্থ বাহির হয় না। যৌগিক পদার্থ বিশ্লেষণে উহার উপাদান মৌলিক পদার্থগুলি পৃথক্ করা যায়।

বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরীক্ষা—একটি কাচের পাত্রে খানিকটা পরিষ্কার চুনের জল লইয়া বাতাসে রাখিয়া দিলে কিছুকাল পরে দেখা যায় যে তাহার উপর একটি সাদা সর পড়িয়াছে (চিত্র ১, ক)। একটি চামচের সাহায্যে সরটি ভাঙ্গিয়া দিলে তাহা পাত্রের তলায় পড়িয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় পাত্রটি রাখিয়া দিলে আবার তাহাতে সর পড়ে। কয়েক বার এইরূপে সর ভাঙ্গিয়া দিলে বেশ খানিকটা সাদা গুঁড়া গ্লাসের তলায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ক্যাল্সিয়াম কার্বনেট বা খড়িমাটি (chalk)। চুনের জলের সহিত বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডের (carbon di-oxide) রাসায়নিক সংযোগে ইহা তৈয়ারী হইয়াছে। বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে বলিয়াই পরিষ্কার চুনের জলে এইরকম খড়িমাটির সর পড়ে।



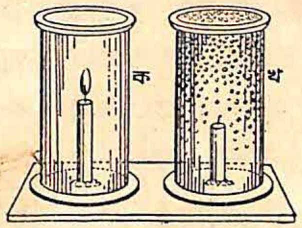
১। (ক) চুনের জলের উপর একটি সর পড়িয়াছে ; (খ) মুখের বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া চুনের জল সাদা হইতেছে

যে সাদা গুঁড়া পড়িল তাহা ছাঁকিয়া লইয়া একটি কাচের পরীক্ষা নলের (test tube) মধ্যে ভরিয়া তাহাতে হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড দিলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাহির হইতে থাকে। ইহা আবার পরিষ্কার চুনের জলের মধ্যে প্রবেশ করাইলে সঙ্গে সঙ্গে চুনের জল দুধের

মত সাদা হইয়া ঘোলাটে হইয়া যায়। এইরূপে চুনের জলের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসের একটি উপাদান।

মুখ দিয়া ফুঁ দিলে যে বাতাস বাহির হয় তাহাতেও কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে। একটি কাচপাত্রে স্বচ্ছ চুনের জল লইয়া তাহাতে একটা নলের সাহায্যে ক্রমাগত ফুঁ দিলে দেখা যাইবে যে ধীরে ধীরে চুনের জল দুধের মত সাদা হইয়া ঘোলাটে হইয়া যাইতেছে। এখানেও মুখের বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে চুন যুক্ত হইয়া খড়িমাটি তৈয়ারী করিয়াছে। সেইজন্যই চুনের জল সাদা হইয়াছে (চিত্র ১, খ)।

বায়ুর অক্সিজেনের পরীক্ষা—বাতাসে যখন একটি মোমবাতি জ্বলে তখন তাহা বাতাসের অক্সিজেনের (oxygen) সাহায্যেই জ্বলিয়া থাকে। একটা জারের মধ্যে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি রাখিয়া জারের মুখ বন্ধ করিয়া দিলে কিছুক্ষণ পরেই মোমবাতি নিবিয়া যায় (চিত্র ২, ক-খ)। ইহার কারণ হইল জারের ভিতর বদ্ধ বাতাসের অক্সিজেন মোমবাতির কার্বনের সহিত যুক্ত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি করে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে জারের মধ্যে ঘামের মত বিন্দু বিন্দু জল লাগিয়া রহিয়াছে (চিত্র ২, খ)। এই জল কোথা হইতে আসিল? মোমবাতিতে কার্বন (carbon) ছাড়া হাইড্রোজেন (hydrogen) বলিয়া আর একটি পদার্থ আছে। উহাও বাতাসে পুড়িয়া বাতাসের অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হয় এবং জলের সৃষ্টি করে। এইরূপে বদ্ধ বাতাসের অক্সিজেন যখন নিঃশেষ হইয়া যায় তখন অক্সিজেনের অভাবে মোমবাতি

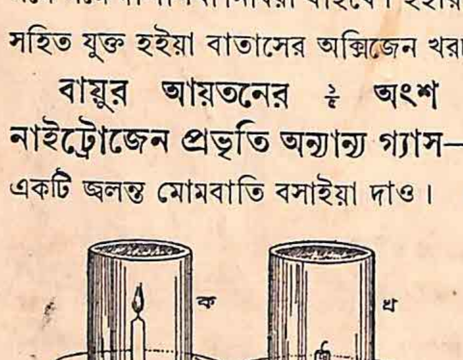


২। (ক) ঢাকা জারের মধ্যে জ্বলন্ত মোমবাতি ; (খ) মোমবাতি নিবিয়া গিয়াছে ও জারের মধ্যে ঘামের মত জলবিন্দু লাগিয়া রহিয়াছে

নিবিয়া যায়। মোমবাতি জ্বলিবার ফলে জারের মধ্যে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈয়ারী হইয়াছে তাহার প্রমাণ এই যে একটু চুনের জল দিয়া জারটি ঝাঁকাইলে চুনের জল ঘোলাটে হইয়া যায়।

অ্যাল্‌ক্যালাইন পাইরোগ্যালল নামক রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যেও বাতাসের অক্সিজেন পরীক্ষা করিতে পারা যায়। একটি লম্বা কাচের জারের মধ্যে খানিকটা অ্যাল্‌ক্যালাইন পাইরোগ্যালল লইয়া জারের মুখে ছিপি বন্ধ করিয়া বেশ করিয়া ঝাঁকিয়া তারপর জারের মুখ খুলিয়া তাহার মধ্যে একটি জ্বলন্ত দীপশিখা প্রবেশ করাইয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে দীপশিখা নিবিয়া যাইবে। ইহার কারণ হইল পাইরোগ্যাললের সহিত যুক্ত হইয়া বাতাসের অক্সিজেন খরচ হইয়া গিয়াছে।

বায়ুর আয়তনের ১/৫ অংশ অক্সিজেন ও ৪/৫ অংশ নাইট্রোজেন প্রভৃতি অন্যান্য গ্যাস—একটি জলভরা পাত্রের মধ্যে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি বসাইয়া দাও। একটি কাচের জার উল্টাইয়া বাতিটি এমন ভাবে চাপা দাও যেন জা.রর খোলা মুখটি জলের মধ্যে সামান্য ডুবিয়া থাকে (চিত্র ৩, ক)। এখন জারের মধ্যে বাতাস আবদ্ধ হইয়া আছে। জ্বলন্ত মোমবাতি কিছুক্ষণ পরে নিবিয়া যাইবে। তখন লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে জারের আয়তনের প্রায় ১/৫ অংশ জলে ভরিয়া গিয়াছে (চিত্র ৩, খ)। ইহার কারণ হইল মোমবাতির দহনের



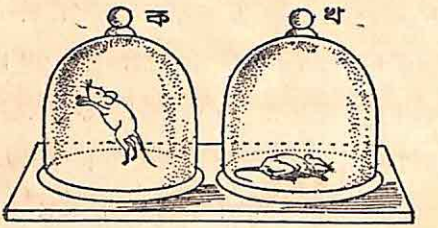
৩। মোমবাতি জ্বলিবার ফলে বাতাসের অক্সিজেন খরচ হইয়া গিয়াছে ও জল উঠিয়া জারের ১/৫ অংশ ভর্তি করিয়াছে

ফলে জারের মধ্যে অক্সিজেন মোমবাতির কার্বন ও হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যথাক্রমে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলবিন্দুতে পরিণত হইয়া জলে মিশিয়া গিয়াছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে দ্রব হয়। ইহার জন্য জারের মধ্যে খানিকটা শূন্য স্থানের সৃষ্টি হয়। সেইজন্য জলপাত্র হইতে জল উঠিয়া জারের $\frac{1}{5}$ অংশ শূন্য স্থান পূর্ণ করে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে বাতাসে আয়তনের $\frac{1}{5}$ অংশ অক্সিজেন এবং $\frac{4}{5}$ অংশ নাইট্রোজেন (nitrogen) ও অন্যান্য গ্যাস থাকে।

শ্বাস-কার্য (Respiration) ও তাহার সহিত বায়ুর সম্বন্ধ—চুলাতে যেমন শিকের ভিতর দিয়া সর্বদা বাতাস প্রবেশ করে এবং চুলার উপর কয়লা পুড়িয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড হইয়া বাতাসে মিশিয়া যায়, সেইরূপ প্রশ্বাসের সহিত ফুসফুসের মধ্যে সর্বদা বাতাস যাইতেছে এবং বাতাসের অক্সিজেন শরীরের কার্বনকে ও হাইড্রোজেনকে দহন করিতেছে এবং উহারা যথাক্রমে কার্বন ডাই-অক্সাইডে ও জলীয় বাষ্পে পরিণত হইয়া নিঃশ্বাসের সহিত বাতাসে মিলিয়া যাইতেছে। আহারের দ্বারা শরীরের এই ক্ষয় পূরণ হইতেছে। শ্বাস-কার্যকে সেইজন্য দহন-কার্যের সহিত তুলনা করা হয়।

বায়ু না হইলে কোন প্রাণী বাঁচে না——কোন প্রাণী বায়ু না হইলে বাঁচিতে পারে না। শীতের রাত্রে ছোট ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া কেরোসিনের বাতি জ্বালাইয়া ঘুমাইলে মানুষ মরিয়া গিয়াছে শুনা যায়। ইহার কারণ কি ? কেরোসিনের বাতি জ্বলার জন্য বন্ধ ঘরের বাতাসের অক্সিজেন কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। সেইজন্য মানুষের শ্বাস-কার্যের জন্য ঘরের মধ্যে সামান্যই অক্সিজেন অবশিষ্ট থাকে। অক্সিজেন না হইলে শরীরের কার্বন ও হাইড্রোজেনের দহন হইতে পারে না। এই দহন-প্রক্রিয়া না চলিলে প্রাণী বাঁচিবার

শক্তি পায় না। একটি ইঁদুরকে বেলজারের মধ্যে চাপা দিয়া রাখিলে কিছুক্ষণ পরে ইঁদুর লাফাইতে থাকে (চিত্র ৪, ক)। অক্সিজেনের অভাবে সে ছট্‌ফট্ করে এবং পরে অবসন্ন হইয়া মরিয়া যায় (চিত্র ৪, খ)। চুলার মধ্যে বাতাস প্রবেশের পথই বন্ধ করিয়া দিলে চুলা যেমন নিবিয়া যায় ইহাও সেইরূপ। অক্সিজেনের সাহায্যে মোমবাতি জ্বলা এবং উহার সাহায্যে শ্বাস-কার্য করিয়া বাঁচিয়া থাকা একই ধরণের প্রক্রিয়া। ইহা বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভোয়াজিয়ে (Lavoisier) প্রমাণ করিয়াছিলেন।



৪। বায়ু না হইলে কোন প্রাণী বাঁচে না

দহন (Combustion)—যে রাসায়নিক ক্রিয়া বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে চলিতে থাকে এবং যাহার ফলে তাপ ও আলো বাহির হয় তাহাকে **দহন** বলে। যে সকল বস্তুতে একবার আগুন লাগিলে বাতাসের মধ্যে জ্বলিতে থাকে, নিবিয়া যায় না, তাহাদের **দাহ্যবস্তু** বলে। কার্বন ও হাইড্রোজেন সেইরূপ দাহ্যবস্তু। ইহারা কাঠ, কয়লা, তেল, মোম, চর্বি, গালা, রজন প্রভৃতি বস্তুর মধ্যে আছে। এই সকল পদার্থ দহনের ফলে অক্সিজেনের সহিত কার্বনের এবং হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সংযোগে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের সৃষ্টি হয় এবং বাতাসে মিশিয়া যায়। দেখিলে মনে হয় যেন দাহ্যবস্তু দহনের জন্য ক্ষয় হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহা নহে। দাহ্যবস্তুর কার্বন ও হাইড্রোজেন পুড়িয়া শুধু রূপান্তরিত হয়। **দহনের ফলে পদার্থের কখনও নাশ হয় না।**

কার্বন ও কার্বনসংযুক্ত বস্তু ছাড়াও অনেক দাহ্য পদার্থ আছে, যেমন, গন্ধক, ফস্‌ফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, ইত্যাদি। ইহাদেরও দহন বাতাসের মধ্যে হইয়া থাকে। দহনের সময় বাতাসের অক্সিজেনের সহিত ইহাদের আপন আপন অক্সাইড (oxide) তৈয়ারী হয়। দহন জনিত অক্সাইড কঠিন, তরল অথবা বায়বীয় যে কোন প্রকারের হইতে পারে। গন্ধক দহনের ফলে গন্ধকের অক্সাইড (সাল্‌ফার ডাই-অক্সাইড) হয়। ইহা বায়বীয়। ফস্‌ফরাস ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম দহনের ফলে ফস্‌ফরাসের এবং ম্যাগ্‌নেসিয়ামের অক্সাইড হয়। ইহারা কঠিন পদার্থ। হাইড্রোজেন দহনের ফলে হাইড্রোজেন অক্সাইড অর্থাৎ জল তৈয়ারী হয়। ইহা তরল পদার্থ।

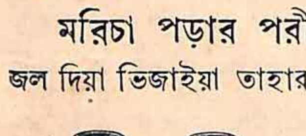
মরিচা (Rusting)—লোহার জিনিস জলে ও বাতাসে পড়িয়া থাকিলে তাহাতে লাল রংয়ের মরিচা পড়ে। লোহার সহিত বাতাসের অক্সিজেনের ধীরে ধীরে রাসায়নিক সংযোগের ফলে লাল লোহার অক্সাইড তৈয়ারী হয়। উহাই লোহার মরিচা এবং লোহার গায়ে লাগিয়া থাকে বলিয়া লোহার উজ্জ্বলতা চলিয়া যায়। লোহার অক্সাইড (iron oxide) যৌগিক পদার্থ। ইহার ধর্ম লোহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কারণ চুম্বক লোহা টানিতে পারে কিন্তু লোহার মরিচাকে টানিতে পারে না। লোহার সহিত বাতাসের অক্সিজেনের ধীরে ধীরে রাসায়নিক সংযোগের ফলে যে মরিচার সৃষ্টি হয় তাহাকে দহন-কার্যের ও শ্বাস-কার্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। দহনের ন্যায় ইহাতে একসঙ্গে বেশী তাপ বা আলো বাহির হয় না বলিয়া ইহাকে শ্বাসকার্যের ন্যায় মৃদু দহন বলা হয়।

মরিচা পড়িতে জল ও বাতাসের প্রয়োজন—বাতাস হইতে জলীয় বাষ্প দূর করিলে লোহায় মরিচা পড়ে না ইহা পরীক্ষার দ্বারা

জানা গিয়াছে। সাধারণতঃ বাতাসে সকল সময়ে অল্পবিস্তর জলীয় বাষ্প থাকে। এই জলীয় বাষ্প বাতাসের অক্সিজেনের সহিত লোহার রাসায়নিক সংযোগ ঘটাইতে সাহায্য করে। জলীয় বাষ্পের মধ্যে বাতাসের অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড সামান্য দ্রব হইয়া থাকে। এই দ্রব অবস্থায় অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড খুব সক্রিয় পদার্থ। সেইজন্য তাহাদের সহিত লোহার রাসায়নিক সংযোগ সহজেই হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইডের একটু অম্লতা (acidity) আছে। উহা লোহার মরিচা পড়িতে আরও সাহায্য করে।

জলকে অনেকক্ষণ ধরিয়া ফুটাইলে জলের মধ্যে যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্রব হইয়া থাকে তাহা বাহির হইয়া যায়। এইরূপ ফোটান জল একটি কাচের পাত্রে লইয়া তাহার মধ্যে লোহা ভরিয়া ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিলে লোহায় মোটেই মরিচা পড়ে না। ইহাতেই দেখা যায় যে **মরিচা পড়ার জন্য অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড দরকার।**

মরিচা পড়ার পরীক্ষা—একটি কাচের জারের ভিতর দিকটা জল দিয়া ভিজাইয়া তাহার মধ্যে কতকগুলি লোহার গুঁড়া ছিটাইয়া দাও। লোহার গুঁড়াগুলি জারের ভিতর পিঠে লাগিয়া থাকিবে (চিত্র ৫, ক)। এইবার জারটি উল্টাইয়া একটি জলপাত্রের মধ্যে বসাইয়া দাও। কয়েক দিন পরে দেখা যাইবে যে লোহার গুঁড়াগুলি মরিচা ধরিয়া লাল হইয়া গিয়াছে এবং জারের মধ্যে খানিকটা জল উঠিয়াছে (চিত্র ৫, খ) এবং ইহা জারের প্রায় $\frac{1}{5}$ অংশের সমান।



৫। লোহায় মরিচা পড়ার পূর্বের (ক) ও পরের (খ) অবস্থা

আগে জারের মধ্যে বাতাস ছিল এবং সেই বাতাসের ⅕ অংশ ছিল অক্সিজেন। লোহায় মরিচা পড়াতে সেই ⅕ অংশ অক্সিজেন লোহার সহিত রাসায়নিক সংযোগে লাল লোহার অক্সাইডে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে জারের মধ্যে বায়ুর অক্সিজেন অপসারিত হওয়াতে জলপাত্র হইতে জল উঠিয়া তাহার ⅕ অংশ স্থান পূর্ণ করিয়াছে। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে লোহায় মরিচা পড়িতে বাতাসের অক্সিজেন খরচ হয়।

শ্বাস-কার্য, দহন ও মরিচার তুলনা

শ্বাস-কার্য	দহন	মরিচা
১। শরীরের সহিত বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হয়।	১। দাহ্য বস্তুর সহিত বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হয়।	১। লোহার সহিত বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হয়। এই রাসায়নিক সংযোগ হইতে হইলে বায়ুর সহিত জলেরও প্রয়োজন।
২। শ্বাস-কার্যের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের সৃষ্টি হয়।	২। দহনের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের সৃষ্টি হয়।	২। মরিচা পড়ার ফলে লাল লোহার অক্সাইড তৈয়ারী হয়।
৩। শ্বাস-কার্যে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মৃদু রাসায়নিক সংযোগ হয়। তাহারই ফলে শরীরে ঈষৎ তাপ হয়। ইহাকে মৃদু দহন বলে।	৩। দহন কার্যে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত খুব দ্রুত রাসায়নিক সংযোগ হয়। ইহার ফলে তাপ ও আলো বাহির হয়। সেই জন্য ইহাকে তীব্র দহন বলে।	৩। মরিচাতে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মৃদু রাসায়নিক সংযোগ হয়। সেই জন্য তাপ বুঝিতে পারা যায় না। ইহাকে মৃদু দহন বলে।

বায়ু চলাচল (Ventilation) এবং ইহার সহিত মানুষের স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ

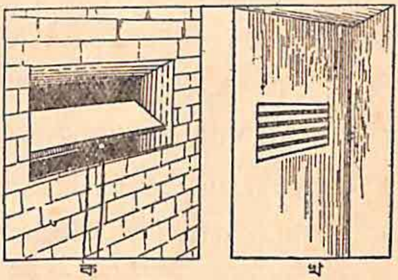
বায়ু কখনও একস্থানে স্থির হইয়া থাকে না। ইহা সর্বদাই নড়াচড়া করে। রৌদ্রের তাপে মাটি, বালি, পাহাড়, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি গরম

হইয়া যায়। সেই সঙ্গে তাহাদের উপরকার বায়ুও গরম হয়। বায়ু গরম হইলেই হাল্‌কা এবং প্রসারিত হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। তখন তাহার স্থান ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া ভরিয়া ফেলে। তাহা আবার কিছুক্ষণ পরে গরম হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং নূতন ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া পুনরায় সেই স্থান দখল করে। গাছপালা দিনের আলোয় বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতে কার্বন গ্রহণ করিয়া বায়ুতে অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়। তাহার জন্যও বায়ুর কিছু চলাচল হইয়া থাকে। বৃষ্টি পড়ার জন্যও বায়ুর চলাচল হয় এবং বৃষ্টি পড়াতে বায়ুর মধ্যের দূষিত গ্যাস ও ধূলিকণা জলের সঙ্গে মিশিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়।

বায়ুর এইরূপ চলাচল হইলে ইহা দূষিত হইতে পারে না। বদ্ধ বায়ুতে দূষিত গ্যাস অথবা রোগের জীবাণু মিশিয়া থাকিলে তাহা বাহির হইয়া যাইতে পারে না ; কিন্তু বায়ু চলাচল হইলে এই দোষ চলিয়া যায়।

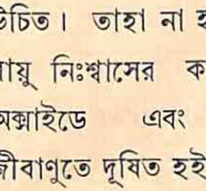
বায়ু নানা কারণে দূষিত হইতে পারে। বদ্ধ বায়ুতে শ্বাস-কার্য ও দহন-কার্য চলিতে থাকিলে যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের সৃষ্টি হয় তাহা বদ্ধ বায়ুতে মিশিয়া থাকে এবং সেই বায়ুতে অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়া গিয়া বায়ু দূষিত হয়। শ্বাস-কার্য এবং রন্ধন-কার্যের জন্য বায়ুর মধ্যে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, কয়লার ধোঁয়া, গন্ধক সংযুক্ত গ্যাস প্রভৃতি মিশিয়া থাকে তাহা বাহির হইতে না পারিলে শ্বাস-কার্যের ব্যাঘাত হয় এবং ইহার জন্য স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। এই সকল ছাড়াও বায়ুতে রোগের জীবাণু থাকে। তাহারাও বদ্ধ হাওয়ার মধ্যে থাকিলে বাহির হইতে পারে না এবং প্রশ্বাসের সহিত ফুসফুসে গিয়া নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি করে। সেইজন্য বায়ু চলাচলের উপর মানুষের স্বাস্থ্য অনেকটা নির্ভর করে।

বাস করিবার এবং রাঁধিবার ঘরের বায়ু চলাচলের প্রণালী—যে সকল ঘর আমরা ব্যবহার করি সেই সকল ঘরে বায়ু চলাচলের ভাল ব্যবস্থা থাকা দরকার। স্কুল-কলেজের যে সকল ঘরে অনেক ছাত্রের একত্র সমাবেশ হয় সেই সকল ঘরেই বায়ু সঞ্চালনের ভাল বন্দোবস্ত থাকা উচিত। তাহা না হইলে ঘরের বায়ু নিঃশ্বাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডে এবং রোগের জীবাণুতে দূষিত হইয়া উঠে।



৬। ভেন্টিলেটার

বায়ু চলাচলের জন্য ঘরের দরজা-জানালা বড় করিতে হয়। জানালাগুলি পরস্পর বিপরীত দিকে থাকিলে বায়ু ভাল চলাচল করিতে পারে। ঘর যদি উঁচু হয় তাহা হইলে দেওয়ালের উপর ছোট ছোট ছিদ্র রাখিতে হয়। ইহাদের ভেন্টিলেটার (ventilator) বলে (চিত্র ৬, ক, খ)। ঘরে বাতি জ্বলিলে এবং অনেক লোক একসঙ্গে থাকিলে ঘরের বাতাস গরম হইয়া উপরে উঠে ও ভেন্টিলেটার দিয়া সহজেই বাহির হইয়া যায়। ঘরে বৈদ্যুতিক বা হাতপাখা চলিলে সেই পাখার হাওয়াতেও ঘরের বদ্ধ বাতাস দরজা-জানালা দিয়া বাহির হইবার সুবিধা পায়।



৭। আকর্ষক পাখা

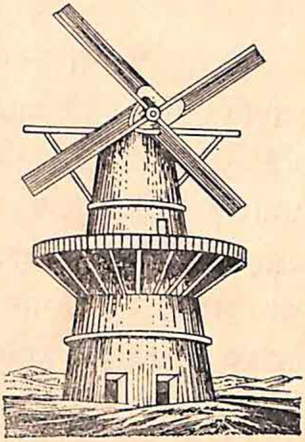
থিয়েটার ও সিনেমা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দৃশ্য দেখান হয়। উপর হইতে বৈদ্যুতিক আকর্ষক পাখার সাহায্যে ঘরের বদ্ধ

ও গরম বায়ু টানিয়া বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া হয় (চিত্র ৭)। সেই সকল ঘরের দেওয়ালের নীচে ছোট ছোট ফোকর থাকে। ঠাণ্ডা ও টাট্‌কা বায়ু সেই সকল ফোকর দিয়া ঘরে প্রবেশ করে।

রান্নাঘরে কয়লা বা গ্যাসের চুলা জ্বালাইয়া লোকে রান্না করে। কয়লা বা গ্যাস জ্বালার জন্য এই সকল চুলা হইতে কয়লার ধোঁয়া এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বাহির হইয়া ঘরের বায়ু শীঘ্রই দূষিত করে। সেইজন্য রান্নাঘরের বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হইলে চুলা হইতে ঘরের দেওয়ালের ভিতর দিয়া ছাদ পর্যন্ত চিম্‌নি রাখিতে হয়। তাহা না হইলে দেওয়াল ছিদ্র করিয়া বাহিরের দিক দিয়া ছাদ পর্যন্ত একটা লোহার বা পোড়ামাটির চিম্‌নি তুলিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে চুলার গরম গ্যাস সেই চিম্‌নি দিয়া সহজেই বাহির হইয়া যায় এবং ঘরের মধ্যে নির্মল ও শীতল বায়ু প্রবেশ করিতে পারে।

গরম বায়ু উপরে উঠে এবং ঠাণ্ডা বায়ু নীচে নামে— একটি কয়লার চুলার উপর হাত রাখিলে মনে হয় যেন গরম বায়ু হাতে ধাক্কা দিতেছে। এক টুকরা পাতলা কাগজ সেখানে ছাড়িয়া দিলে উপরে উঠিয়া যায়। চুলার নীচে বায়ু ঢুকিবার মুখে একটি পাতলা কাগজ ধরিলে দেখা যায় যেন কাগজটিকে ভিতরের দিকে টানিতেছে। সেখানকার বায়ু ঠাণ্ডা। ইহাতেই বুঝা যায় যে ঠাণ্ডা বায়ু চুলার মধ্যে ঢুকিতেছে এবং চুলার গরম বায়ু উপর দিকে উঠিতেছে। কলকারখানার বড় বড় চিম্‌নি দিয়া গরম বায়ুর সহিত কয়লার ধোঁয়া উঠিতে দেখা যায়। গরম বায়ু উপরে উঠে বলিয়াই এইরূপ হইয়া থাকে। যেখানে বড় বড় চুলাতে কয়লা পোড়ে সেখানে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে শোঁ শোঁ শব্দে ঠাণ্ডা বায়ু চুলার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ঠাণ্ডা বায়ু গরম বায়ু অপেক্ষা ভারী বলিয়া নীচে নামিয়া আসে।

হাওয়া-কল হইতে শক্তি উৎপাদন (Windmill as generator of energy)—যে যন্ত্রের সাহায্যে হাওয়ার শক্তিকে নানা কাজে লাগান যায় তাহাকে **উইণ্ড মিল** (windmill) বা **হাওয়া-কল** বলে (চিত্র ৮)। একটি গোলাকার লোহার বা কাঠের অনুভূমিক অক্ষদণ্ডের ((horizontal shaft) চারদিকে কয়েকটা বড় পাতলা লোহার বা কাঠের পাখা আটকাইয়া দিয়া তাহাকে উঁচু খুঁটির বা থামের উপর বসাইয়া দিলে পাখাতে যখন হাওয়া লাগে তখন পাখাগুলি ও সঙ্গে সঙ্গে অক্ষদণ্ডটি ঘুরিতে থাকে। এই ঘূর্ণায়মান অক্ষদণ্ডের সহিত মোটা মোটা দড়ি বা বেল্‌টিং (belting) লাগাইয়া নীচে মাটির উপরেও চাকা চালান যায়। এই সকল চলন্ত চাকার শক্তি হইতে গম ভাঙ্গা, কূপ হইতে জল উঠান, ক্ষেতে জল সেচ, ঘানি হইতে তেল বাহির করা প্রভৃতি নানাপ্রকার কাজ করা যাইতে পারে। এইরূপে বায়ু-প্রবাহের শক্তিকে কাজে লাগান হইয়া থাকে। ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে কয়লার অভাবের জন্য এই প্রকার হাওয়া-কলের যথেষ্ট ব্যবহার আছে।



৮। হাওয়া-কল বা উইণ্ড মিল

দ্বিতীয় অধ্যায়

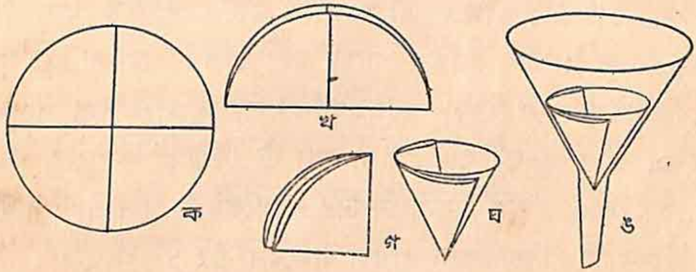
জল (Water)

জলের উৎপত্তি—নদী, হ্রদ, পুষ্করিণী, কূপ, নলকূপ ও ঝরণা প্রভৃতি জলাধার হইতে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী জল পাওয়া যায়। এই জলকে মিষ্ট জল (sweet water) বলে। সমুদ্র যদিও বিশাল জলাধার কিন্তু তাহার জল লবণাক্ত। সাধারণতঃ এই সকল প্রাকৃতিক জলে নানাপ্রকার পদার্থ মিশিয়া থাকে বলিয়া উহা স্বাভাবিক অবস্থায় পান করিবার উপযোগী হয় না। কোনও কোনও ঝরণার জল মাটির মধ্যে বিস্তর কাঁকর, বালি প্রভৃতির স্তর ভেদ করিয়া আসে বলিয়া পরিস্রুত (filtered) হইয়া যায়। সেইজন্য ঐ জল পান করিতে পারা যায়।

দূষিত জল—জল নানা কারণে দূষিত হইয়া থাকে। জলে মল-মূত্র পড়িলে, রোগগ্রস্ত লোকের কাপড়-জামা কাচিলে, ড্রেনের নোংরা জল আসিয়া মিশিলে, কলকারখানার ময়লা জল ছাড়িয়া দিলে, পাট পচাইলে ও অন্যান্য কারণে উহা দূষিত হইয়া যায়। এইরূপ দূষিত জল পান করিলে নানাপ্রকার পীড়া হয়। ইহাতে মানুষ মরিয়াও যাইতে পারে। কলেরা সাধারণতঃ দূষিত জলের দ্বারাই সংক্রামিত হয়। সেইজন্য পানীয় জল সর্বদা শোধন করিয়া পান করা উচিত।

দূষিত জল শোধন করিবার প্রণালী—দূষিত জল দুই প্রকার, যথা,—(১) ঘোলা জল, যাহাতে মাটি, বালি ও অন্যান্য পদার্থ মিশিয়া থাকে এবং (২) জীবাণু-দূষিত জল, যাহার মধ্যে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশা প্রভৃতি রোগের জীবাণু থাকে। নানা উপায়ে এই জলকে পরিষ্কার করা যাইতে পারে।

(১) আস্রাবণ বা কাত করিয়া ঢালন (Decantation)—একটি গ্লাসে ঘোলা জল লইয়া উহা স্থিরভাবে রাখিলে দেখা যাইবে



৯। ফিল্টার কাগজ ভাঁজ করিবার পদ্ধতি

যে কাদা ধীরে ধীরে গ্লাসের তলায় জমা হইতেছে ও উপরের জল প্রায় পরিষ্কার হইয়াছে। এখন সাবধানে নীচের কাদা না নাড়িয়া উপরের জল ধীরে ধীরে অন্য পাত্রে ঢালিলে কতকটা পরিষ্কার জল পাওয়া যাইতে পারে। এইভাবে উপরের জলকে ঢালিয়া ফেলাকে **আস্রাবণ** বলে।

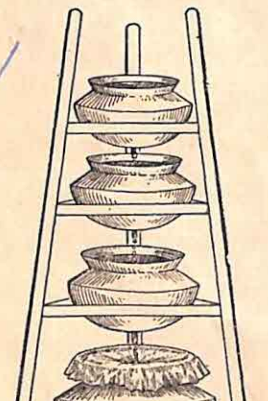


১০। ফিল্টার কাগজের ভিতর দিয়া অবিশুদ্ধ জলকে ছাঁকিয়া ফেলা হইতেছে

(২) পরিস্রাবণ বা ছাঁকন (Filtration)—ছাঁকিয়া ফেলিলে জলকে একেবারে পরিষ্কার করা যায়। সাধারণতঃ আমরা মিহি কাপড় দিয়া জল ছাঁকি। ময়লা প্রায় সবই কাপড়ের উপর থাকিয়া যায়। কিন্তু ময়লা যদি কাপড়ের ছিদ্র অপেক্ষা ছোট হয়, তাহা হইলে

কাপড়ের ভিতর দিয়া কতক ময়লা চলিয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে ছাঁকার জন্য ফিল্টার কাগজ (filter paper) ব্যবহার করা হয়। ফিল্টার কাগজ ব্লটিং কাগজের মত, আকৃতিতে গোল (চিত্র ৯, ক)। তাহা ভাঁজ করিয়া কাচের ফানেলের উপর রাখিয়া জল দিয়া ভিজাইয়া দিলে ফিল্টার কাগজখানি ফানেলে আটকাইয়া থাকিবে (চিত্র ৯, ঙ)। এখন যদি ঘোলা জল ঐ ফিল্টার কাগজের উপর ঢালা হয়, তাহা হইলে ময়লা ফিল্টার কাগজের উপর রহিয়া যাইবে এবং একেবারে পরিষ্কার জল পাওয়া যাইবে (চিত্র ১০)।

(ক) **ফটকিরি দিয়া থিতান**—ঘোলা জল ফটকিরি দিয়া থিতাইয়া পরিষ্কার করা যায়। ফটকিরির সাহায্যে জলের ময়লা জমাট বাঁধিয়া তাড়াতাড়ি তলায় পড়িয়া যায়। তাহার পরে উপরের পরিষ্কার জল কাত করিয়া অন্য পাত্রে ঢালিয়া লওয়া যায় অথবা একটা পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া অল্প সময়ের মধ্যে পরিষ্কার জল পাওয়া যায়।


১১। ফিল্টার

(খ) **ফিল্টার**—ঘোলা জল বাড়ীতে ছাঁকিয়া পরিস্রুত করা হয়। কাঠ কয়লা, বালি প্রভৃতির স্তর করিয়া তাহার ভিতর দিয়া জল ঝরিতে দিলে জলের গন্ধ কয়লায় টানিয়া লয় ও জলের ময়লা বালির মধ্যে আটকাইয়া যায় এবং পরিষ্কার জল বাহির হইয়া আসে। একটি কাঠের মঞ্চের উপর পর পর চারিটি মাটির হাঁড়ি বা কলসী সাজাইতে হয় (চিত্র ১১)। উপরের তিনটি পাত্রের প্রত্যেকটির তলায়

একটি ছোট ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রে পাট বা সূতা আটকাইয়া দেওয়া হয়। উপরের প্রথম পাত্রে শুধু অবিশুদ্ধ জল থাকিবে। দ্বিতীয় পাত্রে কাঠ কয়লা, তৃতীয় পাত্রে বালি এবং চতুর্থ পাত্রটি খালি থাকিবে। উপরের পাত্র হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল কাঠ কয়লার উপর পড়িয়া সেখান হইতে চুয়াইয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া বালির উপর পড়িবে এবং বালির পাত্র হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল নীচের খালি পাত্রে জমা হইবে। এইরূপ পরিস্রুত জল পানের উপযোগী। হাঁড়ির বালি এবং কাঠ কয়লা সপ্তাহে একবার করিয়া বদলাইয়া দেওয়া দরকার। তাহা না হইলে উহাদের মধ্যে বেশী ময়লা জমিলে জল পরিস্রুত হইবে না। ঐ সকল ময়লা হইতে জল আবার দূষিত হইতে পারে।

(৩) **নির্বীজন** (Sterilisation)—জলের মধ্যে রোগের জীবাণু থাকিলে সেই জল ফিল্টার করিয়া পরিষ্কার করিলেও পানের উপযোগী হয় না। জীবাণুরা অতিশয় ক্ষুদ্র; তাহাদের খালি চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জল ফুটাইয়া অথবা ক্লোরিন, পটাশ পারমান্‌গ্যানেট প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য মিশাইয়া শোধন করিতে হয়। ইহাতে জলের জীবাণু মরিয়া যায় এবং জল পান করিবার উপযুক্ত হয়। এইরূপে জীবাণু-দূষিত জলকে ফুটাইয়া অথবা রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া শোধন করাকে **নির্বীজন** বলে।

জল অনেকক্ষণ রৌদ্রে রাখিয়া দিলেও জীবাণু মরিয়া যায়। কারণ সূর্যের রশ্মির মধ্যে অতিবেগনী অথবা রঙ্গোত্তর রশ্মি (ultraviolet) আছে। এই রশ্মির জীবাণু নাশ করিবার ক্ষমতা আছে। সেইজন্য অতিবেগনী রশ্মির সাহায্যেও জল শোধন করা যায়।

বড় বড় শহরে নদীর বা হ্রদের জল এক জায়গায় আনিয়া তাহাতে

ফটকিরি দিয়া থিতাইতে দেওয়া হয়। ইহাতে ময়লা জমাট বাঁধিয়া জলের নীচে তলানী পড়ে। তাহার পরে সেই পরিষ্কার জল ক্লোরিন দিয়া শোধিত করা হয়। সেই শোধিত জল নল দিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে পাঠান হইয়া থাকে। ইহাতে শহরবাসীদের পানের উপযোগী জল পাইবার খুব সুবিধা হয়।

(৪) **পাতন** (Distillation)—জল শোধন করিলে তাহা পান করিবার উপযোগী হয় বটে কিন্তু শোধিত জলের মধ্যে লবণ জাতীয় পদার্থ থাকিয়া যায়। ঔষধ তৈয়ারী করিতে অনেক সময় বিশুদ্ধ জলের দরকার হয়। সেই জলে কোন দ্রবণীয় পদার্থ থাকিলে উহা ব্যবহার করা যায় না। জল বিশুদ্ধ করিতে হইলে জলকে ফুটাইয়া জলীয় বাষ্পকে ঠাণ্ডা করিয়া পুনরায় জলে পরিণত করিতে হয়। জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা করিয়া যে জল পাওয়া যায় তাহাকে **পাতিত বা বিশুদ্ধ জল** (distilled water) বলে। ইহার মধ্যে কোন দ্রবণীয় পদার্থ থাকে না। জল ফুটাইবার পাত্রের মধ্যে তাহা পড়িয়া থাকে। বিশুদ্ধ জল এবং শোধিত জল এক বস্তু নহে। শোধিত জলের মধ্যে দ্রবণীয় পদার্থ থাকে কিন্তু বিশুদ্ধ জলে তাহা থাকে না। সেইজন্য বিশুদ্ধ জল পান করিতে বিস্বাদ লাগে।



১২। তির্যক্ পাতন

জল ফুটাইয়া জলীয় বাষ্পকে ঠাণ্ডা করিয়া পুনরায় জলে পরিণত করাকে **পাতন বা তির্যক্ পাতন** (distillation) বলে। জলকে পাতন করিতে হইলে পাতন-যন্ত্রের

সাহায্য লইতে হয় (চিত্র ১২)। পাতন যন্ত্রের একটি ফ্লাস্কে জল ফুটান হয়। তাহাতে যে জলীয় বাষ্প হয় তাহা শীতকের (condenser) সাহায্যে ঠাণ্ডা হইয়া জলে পরিণত হয়। শীতকের মধ্যে একটি নল থাকে যাহার মধ্যে গরম জলীয় বাষ্প প্রবেশ করে। এই নলের চারি ধারে আর একটি মোটা নল লাগান থাকে। নীচে একটি নল দিয়া টাণ্ডা জল ইহার মধ্যে প্রবেশ করে ও উপরের একটি নল দিয়া ঠাণ্ডা জল উহা হইতে বাহির হইয়া যায়। সেইজন্য শীতকের মধ্যে গরম জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা হইয়া জলে পরিণত হয়। এই ঠাণ্ডা পাতিত জলকে আর একটি ফ্লাস্কে ধরা হয়।

প্রাকৃতিক জলের মধ্যে বৃষ্টির জলকে পাতিত জল বলা চলে। সমুদ্র, নদী প্রভৃতি হইতে জল বাষ্প হইয়া আকাশে মেঘ হয়। মেঘ ঠাণ্ডা হইলে উহা আবার জলে পরিণত হয় এবং বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে পড়ে। সেইজন্য বৃষ্টির জল অনেক পরিষ্কার ও সাধারণতঃ পানের উপযোগী। কেবল বায়ুর সামান্য কিছু গ্যাস উহাতে দ্রব থাকে।

শোধিত জল ব্যবহারের উপকারিতা—শোধন করা জল ব্যবহার করিলে মানুষের অনেক রোগ হইবার সম্ভবনা থাকে না। পল্লীগ্রামের লোকেরা অনেক সময় অতি অপরিষ্কার পুকুরের জলে স্নান করিয়া থাকে। সেই জলে বাসন মাজা, কাপড় জামা কাচা, এমন কি গরু-মহিষকে স্নান করান হয়। ফলে এই সকল পুকুরের জল দূষিত হইয়া থাকে। সেইজন্য পল্লীগ্রামে কোন সংক্রামক রোগ দেখা দিলে বহুলোক তাহাতে আক্রান্ত হয়। পুকুরের দূষিত জলে ব্লিচিং পাউডার কিংবা পটাশ পারম্যান্‌গ্যানেট দিলে জলের দোষ কাটিয়া যায়।

মৌলিক পদার্থ (Element), মিশ্র পদার্থ (Mechanical Mixture) ও যৌগিক পদার্থ (Chemical Compound)

মৌলিক পদার্থ—সকল রকম পদার্থেরই গঠনের উপাদান আছে। যে সকল পদার্থের মধ্যে একটি মাত্র উপাদান পাওয়া যায় তাহাদের **মৌলিক পদার্থ** বলে, যেমন লোহা (কঠিন পদার্থ), পারা (তরল পদার্থ), অক্সিজেন (বায়বীয় পদার্থ) প্রভৃতি। ইহাদের বিশ্লেষণ করিলে শুধু একই পদার্থ পাওয়া যাইবে। মৌলিক পদার্থগুলির নিজেদের ধর্মের বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাদের মিশ্রণ এবং রাসায়নিক সংযোগের ফলে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে।

মিশ্র পদার্থ—কোন পদার্থের মধ্যে একাধিক উপাদান থাকিলে, এবং সেই উপাদানগুলির স্বকীয় ধর্ম সেই পদার্থের মধ্যে বর্তমান থাকিলে, সেই পদার্থকে **মিশ্র পদার্থ** বলে। চিনি এবং বালি মিশাইয়া একটি পদার্থ তৈরী করিলে তাহাকে মিশ্র পদার্থ বলিতে হইবে। কারণ, ইহার মধ্যে চিনি ও বালির নিজস্ব ধর্ম বর্তমান থাকে। জলে গুলিয়া বালি হইতে চিনিকে সহজেই বিচ্ছিন্ন করা যায়। লোহার গুঁড়া, গন্ধকের গুঁড়া ও চিনি মিশাইয়া একটি পদার্থ তৈরী করিলে তাহাকেও মিশ্র পদার্থ বলিতে হইবে। কারণ, ইহার মধ্যে লোহা, গন্ধক ও চিনির নিজস্ব ধর্মের কোনও পরিবর্তন হয় না। চুম্বকের সাহায্যে এই মিশ্র পদার্থ হইতে লোহাকে পৃথক্ করা যায় (চিত্র ১৩)। তারপর জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া গন্ধক হইতে চিনিকে পৃথক্ করা যায়, কারণ জলে চিনি দ্রব কিন্তু গন্ধক অদ্রবণীয়। এইরূপে লোহা, গন্ধক ও চিনি প্রত্যেকটিকেই ইহাদের মিশ্রণ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়। মিশ্র পদার্থের নিজের কোন ধর্ম নাই।

উপাদানগুলির ধর্ম‌ই ইহার ধর্ম। মিশ্র পদার্থে ইহার উপাদানগুলি যে কোনও পরিমাণে বর্তমান থাকিতে পারে। লোহার গুঁড়া, গন্ধকের গুঁড়া ও চিনি ইচ্ছামত পরিমাণে মিশাইতে পারা যায়। তাহা হইলেও মিশ্রণে সব উপাদানের গুণ বর্তমান থাকিবে। আর মিশ্রণের সময় কোনও তাপের পরিবর্তন হয় না।



১৩। চুম্বকের সাহায্যে লোহার গুঁড়াকে পৃথক্ করা হইতেছে

যৌগিক পদার্থ—কোনও পদার্থের মধ্যে একাধিক উপাদান থাকিলে ও সেই উপাদানগুলির স্বকীয় ধর্ম সেই পদার্থের মধ্যে বর্তমান না থাকিলে সেই পদার্থকে **যৌগিক পদার্থ** বলে। যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলি রাসায়নিক সংযোগে (chemical combination) যুক্ত থাকে। রাসায়নিক সংযোগে সম্পূর্ণ নূতন জিনিসের সৃষ্টি হয়। সেই জন্য যৌগিক পদার্থের ধর্ম তাহার উপাদানগুলির ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। উপাদানগুলিকেও সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যৌগিক পদার্থের মধ্যে উপাদানগুলির পরিমাণ বা মাত্রা নির্দিষ্ট থাকে। অনেক সময় তাপের সাহায্যে ইহাদের রাসায়নিক সংযোগ করা যায় এবং রাসায়নিক সংযোগের ফলে অনেক সময় উত্তাপ ও আলো বাহির হইয়া থাকে।

লবণ একটি যৌগিক পদার্থ। সোডিয়াম এবং ক্লোরিন ইহার দুইটি উপাদান। দুইটি উপাদানই বিষ। কিন্তু লবণ ইহাদের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থ এবং মানুষের নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী

মিশ্র ও যৌগিক পদার্থের তুলনা

মিশ্র পদার্থ	যৌগিক পদার্থ
১। ইহার উপাদান সহজে পৃথক্ করা যায়।	১। ইহার উপাদান সহজে পৃথক্ করা যায় না।
২। ইহার উপাদানগুলির স্বকীয় ধর্ম বর্তমান থাকে।	২। ইহার মধ্যে উপাদানের ধর্ম বর্তমান থাকে না। সম্পূর্ণ নূতন জিনিসের সৃষ্টি হয়।
৩। ইহার মধ্যে উপাদান যে কোন পরিমাণে থাকিতে পারে।	৩। ইহার মধ্যে উপাদানের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে।
৪। ইহা প্রস্তুত করিবার সময় কোন তাপের পরিবর্তন হয় না।	৪। ইহা সৃষ্টি হইবার সময় তাপের পরিবর্তন হইয়া থাকে।

বায়ু ও জলের উপাদানগুলির ধর্ম

বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ। ইহার মধ্যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প এবং আর্গন প্রভৃতি গ্যাস আছে। জল একটি তরল যৌগিক পদার্থ। ইহার উপাদান হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন। ইহারা মৌলিক বায়বীয় পদার্থ। ইহাদের রাসায়নিক সংযোগে জলের সৃষ্টি হয়। জলের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালনা করিলে জল বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং ১৮ ভাগ জল হইতে ২ ভাগ হাইড্রোজেন এবং ১৬ ভাগ অক্সিজেন পাওয়া যায়। এই সকল বিভিন্ন উপাদানের বিভিন্ন ধর্ম আছে। উপাদানগুলির ধর্ম নিম্নে দেওয়া হইল।

অক্সিজেন—ইহা বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন একটি মৌলিক বায়বীয় পদার্থ। ইহা বাতাসে মৌলিক অবস্থায় এবং জল ও মাটিতে যৌগিক অবস্থায় থাকে। ইহার সাহায্যেই শ্বাস-কার্য, দহন-কার্য এবং মরিচা পড়া সম্ভব, কিন্তু ইহা নিজে জ্বলে না।

অক্সিজেন বাতাস অপেক্ষা অল্প ভারী। ইহা জলে সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। একটি অগ্নিকণাযুক্ত অঙ্গার খণ্ড একটা জারে (jar) অক্সিজেনের মধ্যে ঢুকাইয়া দিলে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।

নাইট্রোজেন—ইহা বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন একটি মৌলিক বায়বীয় পদার্থ। ইহা বাতাসে মৌলিক অবস্থায় থাকে। ইহার সহিত অন্য পদার্থের সহজে রাসায়নিক সংযোগ হয় না। সেইজন্য ইহাকে নিষ্ক্রিয় (inert) গ্যাস বলা হয়। ইহা বাতাস অপেক্ষা সামান্য হাল্কা। ইহা নিজে জ্বলে না বা দহন-কার্যে সাহায্য করে না। ইহার মধ্যে কোন প্রাণী বাঁচিতে পারে না। ইহা জলে খুব সামান্য দ্রবীভূত হয়। বাতাসে নাইট্রোজেনের মাত্রা অক্সিজেন অপেক্ষা ৪ গুণ বেশী।

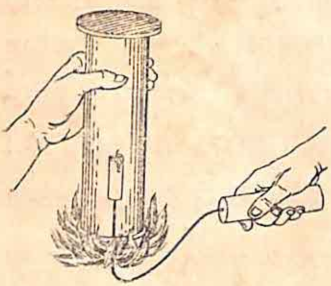
কার্বন ডাই-অক্সাইড—ইহা বর্ণহীন, অতিমৃদু গন্ধ ও অম্ল স্বাদ বিশিষ্ট একটি যৌগিক বায়বীয় পদার্থ। কার্বনের সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে ইহার সৃষ্টি হয়। ইহা নিজে জ্বলে না বা দহন-কার্যে সাহায্য করে না। কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হয় এবং জলের উপর কার্বন ডাই-অক্সাইডের চাপ দিলে উহা অনেক বেশী দ্রবীভূত হয়। এইরূপ জলকে **বাতান্বিত জল** বা সোডার জল (aerated water) বলে।

কার্বন ডাই-অক্সাইডের মধ্যে একটি জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ঢুকাইয়া দিলে উহা নিবিয়া যায়। চুনের জলের সহিত কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশিলে উহা দুধের মত সাদা ও ঘোলাটে হইয়া যায়। ইহার কারণ খড়িমাটি (chalk) বা ক্যাল্‌সিয়াম কার্বনেট (calcium carbonate) তৈয়ারী হয়।

জলীয় বাষ্প—সমুদ্র, নদ, নদী, প্রভৃতি পৃথিবীতে যত জলাশয় আছে রৌদ্রের তাপে তাহাদের জল বাষ্প হইয়া বাতাসে মিশিতেছে।

সেইজন্য বাতাসে সর্বদা জলীয় বাষ্প থাকে। বাতাসের জলীয় বাষ্প হইতে মেঘের সৃষ্টি হয় এবং মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির ফলে বাতাসের দূষিত গ্যাস ও ধূলিকণা ধুইয়া মাটিতে পড়ে এবং বাতাস বিশুদ্ধ হয়। বৃষ্টির জল মাটিতে পড়িয়া পুষ্করিণী, নদ, নদী প্রভৃতি পূর্ণ করিয়া ফেলে। প্রাণীরা জল ছাড়া প্রাণ ধারণ করিতে পারে না। গাছপালা ভিজামাটি হইতে রস টানিয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকে এবং কৃষিকার্যের সুবিধা হয়। এইরূপে বাতাসের জলীয় বাষ্প উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর জীবনের জন্য একান্ত আবশ্যক।

হাইড্রোজেন—ইহা বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন একটি মৌলিক বায়বীয় পদার্থ। সমুদয় পদার্থের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা হাল্‌কা পদার্থ। জল হইতেই ইহা সাধারণতঃ উৎপন্ন হয়। ইহা নিজে জ্বলে কিন্তু দহনকার্যে সাহায্য করে না। একটি জ্বলন্ত মোমবাতি হাইড্রোজেনের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে বাতির আগুন নিবিয়া যায় কিন্তু হাইড্রোজেন জ্বলিয়া উঠে (চিত্র ১৪)। ইহা জ্বলিলে নীল আভাযুক্ত আলো বাহির হয়। বাতাসের অক্সিজেন ইহার দহনের জন্য আবশ্যক। এই দহনের ফলে জলের সৃষ্টি হইয়া থাকে।



১৪। জারের মধ্যে মোমবাতি নিবিয়া গিয়াছে এবং জারের মুখে হাইড্রোজেন জ্বলিয়া উঠিয়াছে

দ্রাবক (**Solvent**), দ্রাব (**Solute**), ও দ্রবণ (**Solution**)—জলে কোন জিনিস গলিয়া থাকিলে তাহা জলের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া থাকে। তখন তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

যেমন চিনি জলে গলিলে চিনিকে আর দেখা যায় না। বস্তুর যদি কোন রং থাকে, যেমন নীল বর্ণের তুঁতে, তাহা হইলে জলের সেই রং হয়। বস্তুকে দ্রব করিবার শক্তি আছে বলিয়া জলকে **দ্রাবক** বলা হয়। যে সকল বস্তু জলে দ্রবীভূত হয় তাহাদের **দ্রাব** এবং জলে বস্তুর দ্রবীভূত হইয়া থাকার অবস্থাকে **দ্রবণ** বা **দ্রব** বলে।

জলের দ্রাবকশক্তি—জলের দ্রাবকশক্তি খুব প্রবল। কারণ, জলের মধ্যে অনেক কঠিন, তরল এবং বায়বীয় পদার্থ দ্রবীভূত হইয়া যায়। চিনি, লবণ, সোডা, ফট্‌কিরি প্রভৃতি কঠিন পদার্থ, স্পিরিট ও তুধ প্রভৃতি তরল পদার্থ, এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি বায়বীয় পদার্থ সবই জলে দ্রবীভূত হয়। কিন্তু সকল দ্রাব পদার্থ জলে সমান পরিমাণে দ্রবীভূত হয় না। পদার্থ বিশেষে ইহার কমবেশী হইয়া থাকে। জলের দ্রাবকশক্তির একটা সীমা আছে। যেমন, চিনি জলে দিলে গলিয়া যায় বটে, কিন্তু জলের পরিমাণ ঠিক রাখিয়া ইহাতে একটু করিয়া চিনি মিশাইতে থাকিলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় যে চিনি আর জলে দ্রব হইতেছে না; চিনি জলের নীচে পড়িয়া আছে। এই অবস্থায় জল চিনির দ্বারা **সংপৃক্ত** (saturated) হইয়াছে বলা হয়। দ্রাব বস্তু দ্রাবকের মধ্যে দ্রবীভূত হইতে হইতে যে অবস্থায় আর দ্রব হইতে চায় না তখন সেই দ্রবকে **সংপৃক্ত দ্রব** (saturated solution) বলে। অতএব যখন কোনও দ্রব সংপৃক্ত হয় তখন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাব বস্তু দ্রবীভূত থাকে।

সংপৃক্ত দ্রবের মধ্যে দ্রাব বস্তুর পরিমাণ দ্রাবকের তাপের উপর নির্ভর করে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা দ্রাবকের মধ্যে কম দ্রাব বস্তু দ্রবীভূত থাকে এবং দ্রাবক গরম করিলে উহাতে বেশী দ্রাব বস্তু

দ্রবীভূত হইয়া যায়। ইহা ঠাণ্ডা করিলে অতিরিক্ত দ্রাব বস্তু ধীরে ধীরে নীচে পড়িতে থাকে। চিনি গরম জলে গলাইয়া তাহা ধীরে ঠাণ্ডা করিলে ও উহার মধ্যে একটা সূতা ঝুলাইয়া দিলে অতিরিক্ত চিনি সূতার চারিদিকে মিশ্রির আকারে দানা বাঁধে। তবে কোন কোন দ্রাব বস্তুর পক্ষে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন, লবণ। তাপের সহিত ইহার দ্রবণের বেশী তারতম্য হয় না। ঠাণ্ডা এবং গরম জলে উহা প্রায় সমান দ্রবণীয়।

দ্রবণ ও মিশ্রণের তুলনা—কোন দ্রাবকের মধ্যে দ্রাব বস্তুর দ্রবণ হইলে দ্রবণের যে কোন স্থানে দ্রাব বস্তুর পরিমাণ সমান থাকে। কোন স্থানেই ইহার কমবেশী হয় না। কিন্তু মিশ্রণের মধ্যে উপাদানগুলির পরিমাণ সকল স্থানে সমান থাকে না। বালি ও জলের মিশ্রণ এবং চিনি ও জলের দ্রবণের তুলনা নীচে দেওয়া হইল।

মিশ্রণ ও দ্রবণের তুলনা

বালি ও জলের মিশ্রণ	চিনি ও জলের দ্রবণ
১। জল ও বালি পাশাপাশি থাকে এবং বালিকে চোখে দেখা যায়। ২। বালিকে ছাঁকিলেই পৃথক্ করা যাইতে পারে। ৩। যে কোনও পরিমাণ বালি ও জল মিশান যাইতে পারে। ৪। মিশ্রণের সর্বত্রই সমান অংশ জল ও বালি না থাকিতে পারে।	১। চিনিকে দেখা যায় না। ২। চিনিকে পাইতে হইলে দ্রব জাল দিতে হইবে, ছাঁকিলে হইবে না। ৩। যে কোনও পারিমাণ চিনি জলে দ্রব করা যায় না। সংপৃক্ত হইলে আর বেশী চিনি গলিবে না। ৪। দ্রবের সর্বত্রই সমান অংশ চিনি থাকিবে।

বায়ুর আর্দ্রতা (Humidity)

বায়ুতে সকল সময়ে জলীয় বাষ্প থাকে। বায়ুর আর্দ্রতা জলীয় বাষ্পের উপর নির্ভর করে। আবার উষ্ণতার তারতম্যের জন্য বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমবেশী হইয়া থাকে। গরম বায়ুতে যতটা জলীয় বাষ্প থাকিতে পারে, ঠাণ্ডা বায়ুতে ততটা থাকে না।

সংপৃক্ত বায়ু—বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে যখন জলীয় বাষ্প আর বাষ্পাকারে থাকিতে না পারিয়া বায়ু হইতে জলবিন্দু হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয় তখন সেই বায়ুকে **সংপৃক্ত বায়ু** (saturated air) বলে। এই অবস্থায় বায়ু আর জলীয় বাষ্প বহন করিতে পারে না। সেইজন্য সংপৃক্ত বায়ুর আর্দ্রতা সর্বাপেক্ষা বেশী। কতটা জলীয় বাষ্প থাকিলে বায়ু সংপৃক্ত হইবে তাহা বায়ুর উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। ঠাণ্ডা বায়ুকে সংপৃক্ত করিতে যতটা জলীয় বাষ্প দরকার, গরম বায়ুকে সংপৃক্ত করিতে তাহা অপেক্ষা বেশী জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ফলে গরম ও ভিজা বায়ু ঠাণ্ডা হইলে উহার অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প জমিয়া পুনরায় জল হইয়া যায়। একটি গ্লাসে বরফ রাখিলে দেখা যাইবে যে গ্লাসের বাহিরের গায়ে জলকণা জমিয়াছে (চিত্র১৫)। ইহার কারণ, গরম বায়ু ঠাণ্ডা গ্লাসের গায়ে লাগিয়া ঠাণ্ডা হয়। তখনই সেই বাতাসের জলীয় বাষ্প বহন করিবার শক্তি কমিয়া যায়। সেই কারণে কতকটা জলীয় বাষ্প



১৫। গ্লাসের বাহিরে জলকণা জমিয়াছে

জমিয়া গ্লাসের গায়ে জলবিন্দুতে পরিণত হয়। শীতকালে নিঃশ্বাস ফেলিলে যে সাদা ধোঁয়ার মত বাহির হয় তাহার কারণ একই। আমাদের গরম নিঃশ্বাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প আছে। বাহিরে ঠাণ্ডায় আসিবামাত্র তাহা পুনরায় জমিয়া জলকণা হইয়া যায়। সেই জমাট জলকণাই সাদা ধোঁয়ার মত দেখায়।

মেঘ (Cloud), বৃষ্টি (Rain), শিশির (Dew), কুয়াশা (Fog) ও তুষার (Snow)

মেঘ-বৃষ্টি—সমুদ্র, নদ, নদী প্রভৃতি জলাধার হইতে বাতাসে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প আসে। এই বাষ্প বাতাস অপেক্ষা হাল্‌কা। সেইজন্য উহা বাতাসের উচ্চস্তরে উঠিয়া যায়। বাতাসের উচ্চস্তরের তাপ নিম্নস্তরের তাপ অপেক্ষা কম। ইহার জন্য জলীয় বাষ্প যত উপরে উঠিতে থাকে তত ঠাণ্ডা হয়। উচ্চস্তরের বায়ুমণ্ডলে বাতাসের চাপ কম বলিয়া জলীয় বাষ্প সেখানে বেশী প্রসারিত হইয়া থাকে। প্রসারণের ফলে জলীয় বাষ্পের তাপ আরও কমিয়া যায়। এইরূপে তাপ কমিতে কমিতে জলীয় বাষ্প যখন বাতাসের সংপৃক্তি মাত্রায় উপনীত হয় তখন বাতাসের অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প বিন্দু বিন্দু জলকণায় পরিণত হয় ও বাতাসে ভাসিতে থাকে। ইহাকেই **মেঘ** বলে এবং এইরূপে মেঘের সৃষ্টি হয়। সব মেঘে বৃষ্টি হয় না। মেঘের ছোট ছোট জলকণা যখন পরস্পর সংলগ্ন হইয়া বড় বড় বিন্দুর আকার ধারণ করে তখনই সে মেঘ হইতে **বৃষ্টি** হয়। বাতাসের ভিতর দিয়া বৃষ্টি পড়িবার সময় বাতাসের তাপ যদি বেশী থাকে তাহা হইলে বৃষ্টির জল মাটিতে পড়িবার পূর্বেই উহা আবার বাষ্পে পরিণত হইতে পারে। তাহা হইলে আর বৃষ্টি পড়ে না।

অনেক সময় মেঘের জলকণাগুলি আকাশের অত্যধিক ঠাণ্ডা পাইয়া জমিয়া বরফ হইয়া যায়। তখন সেই মেঘ হইতে **শিলাবৃষ্টি** হইয়া থাকে।

শিশির ও কুয়াশা— শীতকালে শিশির ও কুয়াশা দেখা যায়। শীতের প্রাতে গাছের পাতায় এবং ঘাসের উপর মুক্তার মত যে সকল জলবিন্দু লাগিয়া থাকে তাহাদের **শিশির** বলে। কখন কখন চতুর্দিক ধোঁয়ার মত অন্ধকার দেখায়। অনেক বেলা হইলে তবে সূর্যালোক দেখা যায়। ইহাকে **কুয়াশা** বলে। বাতাসের জলীয় বাষ্প হইতেই শিশির ও কুয়াশার সৃষ্টি হয়।

শীতকালে মাটি, গাছপালা ও জল দিনের বেলায় রৌদ্র হইতে যে তাপ গ্রহণ করে, রাত্রিকালে তাহারা সেই তাপ বাতাসে বিকীর্ণ করিয়া দেয়। গাছের পাতা ও মাটি হইতে তাড়াতাড়ি তাপ বিকীর্ণ হইয়া যায়। সেইজন্য তাহারা বেশী ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। তাহাদের সংস্পর্শে বাতাসও ঠাণ্ডা হইয়া থাকে। ইহার ফলে বাতাসের জলীয় বাষ্প সংপৃক্তি মাত্রার নীচে নামিয়া যায় এবং বাতাসের অতিরিক্ত বাষ্প জল-বিন্দুতে পরিণত হয়। উহাই গাছের পাতায় এবং ঘাসের উপর জমিয়া থাকে। ইহাকে শিশির-পড়া বলে।

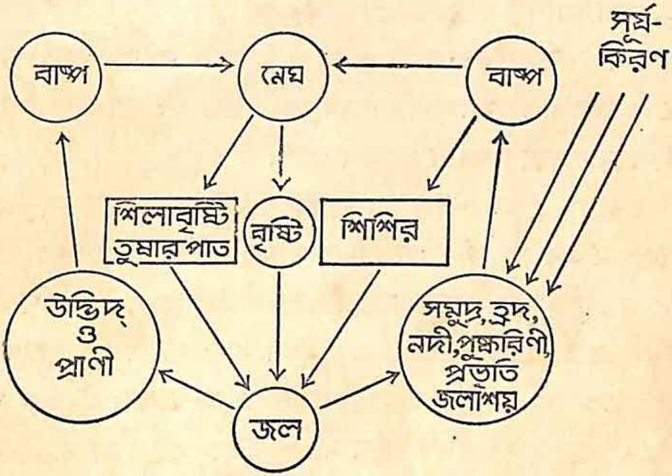
আবার কোন কোন দিন মাটি হইতে বেশী তাপ বিকীর্ণ হইলে মাটি অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে মাটির উপর অনেকদূর পর্যন্ত বাতাসের স্তর ঠাণ্ডা হয়। ইহার জন্য বাতাস সংপৃক্ত হয় এবং বাতাসের অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প বিন্দু বিন্দু জলকণায় পরিণত হইয়া ভাসিতে থাকে। তখন চতুর্দিক ধোঁয়ার মত দেখায় ও কুয়াশার সৃষ্টি করে। মেঘের সহিত ইহার কোন প্রভেদ নাই। মেঘ বাতাসের উচ্চস্তরে এবং কুয়াশা মাটির উপর বাতাসের নিম্নস্তরে সৃষ্টি হয়। সূর্যের তাপ প্রখর হইলে কুয়াশা বাষ্প হইয়া বাতাসে মিশিয়া যায়।

আকাশে মেঘ থাকিলে পৃথিবী হইতে তাপ বেশী বিকীর্ণ হইতে পারে না। সেইজন্য মেঘলা রাতে পৃথিবী ও উহার উপরের বাতাস তত ঠাণ্ডা হয় না এবং শিশির ও কুয়াশা দেখা যায় না। একই কারণে মেঘলা রাতে পরিষ্কার রাত অপেক্ষা বেশী গরম বোধ হয়।

তুষার—পার্বত্য অঞ্চলে এবং শীতপ্রধান দেশে শীতের প্রাবল্য বেশী বলিয়া বাতাসের জলীয় বাষ্প শীঘ্রই সংপৃক্তি মাত্রায় উপনীত হয়। সংপৃক্ত বাতাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু অত্যধিক শীতল হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফ-কণায় পরিণত হয়। তখন বৃষ্টিপাত না হইয়া তুষার-পাত হইয়া থাকে। রাস্তাঘাট বরফ জমিয়া সাদা হইয়া যায়। কখন কখন তুষারবিন্দুগুলি আংশিক তরল থাকে। এইরূপ তুষারকে **শ্লীট** (sleet) বলে।

প্রকৃতিতে জলের সমতা রক্ষা (Water-cycle in nature)—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নদ, নদী, সমুদ্র ও নানা জলাশয় হইতে রৌদ্রের তাপে অনবরত জল বাষ্প হইয়া বাতাসে মিশিতেছে। ইহা ছাড়া মানুষ ও জীবজন্তুর শরীর হইতেও সতত জলীয় বাষ্প তৈয়ারী হইতেছে এবং তাহারা দৈনিক কত জল পান করিতেছে ও নানা প্রকারে খরচ করিতেছে। গ্রীষ্মকালে পল্লীগ্রামে কত জলাশয় শুকাইয়া যায় এবং মানুষ ও জীবজন্তুর কত জলকষ্ট হয়। এইরূপে যদি জল কেবল শুকাইয়া যাইত তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যেই পৃথিবী উদ্ভিদ্ ও প্রাণী শূন্য হইয়া যাইত। কিন্তু প্রকৃতির বিচিত্র কৌশলে পৃথিবীর এক ফোঁটা জলও নষ্ট হইতে পারে না। জল বাষ্প হইয়া বাতাসে মিশিয়া যায়। সেই জলীয় বাষ্প হইতে মেঘের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে মেঘ হইতে বৃষ্টি হইয়া সমস্ত জল পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে। পুষ্করিণী, নদ, নদী, সমুদ্র আবার জলে

ভরিয়া উঠে। সেই জলে পৃথিবীর গাছপালা ফুলে ফলে আবার সুশোভিত হয়। জলের এইরূপ আবর্তন চলিতেছে বলিয়া প্রকৃতিতে জলের সমতা রক্ষা হইয়া থাকে (চিত্র ১৬)।



১৬। জলের আবর্তন

খরজল (Hard water) ও মৃদুজল (Soft water)

জলে সাবান গুলিলে ফেনা হয় ইহা সকলেই জানে কিন্তু এমনও জল আছে, যেমন, সমুদ্রের জল ও নলকূপের (tube-well) জল, যাহাতে সাবান ঘষিলে ভাল ফেনা হয় না। ভাল ফেনা করিতে হইলে বেশী সাবান খরচ করিতে হয়। যে সকল জলে খুব অল্প সাবানেই প্রচুর ফেনা হয় তাহাদের **মৃদুজল** (soft water) এবং যে সকল জলে ফেনা করিতে হইলে বেশী সাবান খরচ করিতে হয় তাহাদের **খরজল** (hard water) বলে।

জলের মধ্যে লবণ জাতীয় পদার্থ দ্রব অবস্থায় থাকে। ইহাদের

মধ্যে ক্যাল্‌সিয়াম এবং ম্যাগ্‌নেসিয়াম ধাতুর বাইকার্বনেট, ক্লোরাইড এবং সাল্‌ফেট লবণ জলে দ্রবীভূত হইয়া থাকিলে সেই জলকে খরজল বলা হয়। তাহা না হইলে জলকে মৃদুজল বলে। খরজল দুইপ্রকার। জলের মধ্যে ক্যাল্‌সিয়ামের এবং ম্যাগ্‌নেসিয়ামের বাইকার্বনেট গলিয়া থাকিলে সেই জলকে **অস্থায়ী খরজল** বলে। আর জলের মধ্যে ক্যাল্‌সিয়ামের এবং ম্যাগ্‌নেসিয়ামের ক্লোরাইড এবং সাল্‌ফেট গলিয়া থাকিলে সেই জলকে **স্থায়ী খরজল** বলে।

খরজলে কেন সহজে সাবানের ফেনা হয় না—জলে ক্যাল্‌সিয়াম এবং ম্যাগ্‌নেসিয়াম লবণ গলিয়া থাকিলে তাহাদের সহিত সাবানের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে। ইহার ফলে যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাহা জলে অদ্রবণীয় এবং উহা দানা বাঁধিয়া তলায় পড়ে। ফেনা হইতে হইলে সাবান অপরিবর্তিত ও জলে দ্রব অবস্থায় থাকা দরকার। সেইজন্য এইরূপ জলে সাবান ঘষিলে ফেনা হয় না। যখন জলের সমস্ত ক্যাল্‌সিয়ামের এবং ম্যাগ্‌নেসিয়ামের লবণ সাবানের সহিত দানা বাঁধিয়া ফুরাইয়া যায়, তখন ঐ জলে ফেনা হইতে পারে।

স্থায়ী খরজলকে মৃদু করিবার প্রণালী—জলের মধ্যে দ্রবীভূত ক্যাল্‌সিয়ামের এবং ম্যাগ্‌নেসিয়ামের লবণকে অদ্রবণীয় (insoluble) করিয়া দূর করিতে পারিলেই খরজল মৃদু হইয়া যায়। সাবানের সাহায্যে ইহা করা যায় কিন্তু ইহাতে অনেক সাবান খরচ হয়।

সোডা ও চুনের সাহায্যে খরজলকে মৃদু করা হয়। খরজলের ক্যাল্‌সিয়াম এবং ম্যাগ্‌নেসিয়ামের লবণ সোডা ও চুনের সহিত মিশিয়া ক্যাল্‌সিয়াম কার্বনেট ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম অক্সাইড হইয়া জলের তলায় পড়িয়া যায়। এইরূপে খরজলকে মৃদু করা হইয়া থাকে এবং

তাহার পরে ইহা অনায়াসে সাবানের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। স্থায়ী এবং অস্থায়ী দুই প্রকার খরজলকেই চুন ও সোডার সাহায্যে মৃদুজলে পরিণত করা যায়।

অস্থায়ী খরজলকে মৃদু করণ—অস্থায়ী খরজলকে অনেকক্ষণ ফুটাইলে জল হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাহির হইয়া যায় এবং ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম অদ্রবণীয় কার্বনেটে পরিণত হইয়া জলের তলায় পড়ে। ইহাতে জল মৃদু হইয়া যায়। এইরূপে শুধু ফুটাইয়া জলকে মৃদু করিতে পারা যায় বলিয়া ইহাকে অস্থায়ী খরজল বলে।

জলচক্র ও বাঁধ হইতে শক্তি উৎপাদন (Water-mills and dams as generators of energy)

জল উঁচু হইতে নীচের দিকে যায় এবং সমতল ভূমিতে আসিয়া স্থির হয়। পৃথিবীতে কত নদ-নদী আছে, যাহাদের জলরাশি প্রবল বেগে সাগরের দিকে ছুটিতেছে। তাহাদের স্রোতের মুখে কত স্থান ভাসিয়া যাইতেছে এবং কত বাধা চুরমার হইতেছে। ইহাতেই বুঝা যায় এই জলপ্রবাহে কত শক্তি আছে। এই শক্তিই মানুষ তাহার অনেক কাজে প্রয়োগ করিতেছে।

জল হইতে দুই প্রকার শক্তি উৎপাদন করা যায়। একটি **যান্ত্রিক চল-শক্তি** (mechanical energy) এবং আর একটি **বৈদ্যুতিক শক্তি** (electrical energy)। অবশ্য বৈদ্যুতিক শক্তি যান্ত্রিক চল-শক্তিরই রূপান্তর মাত্র।

জল হইতে যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদন করিতে হইলে খরস্রোতা নদীর স্রোতের মধ্যে গোলাকার এবং অনেক পাখা যুক্ত একটি চক্র

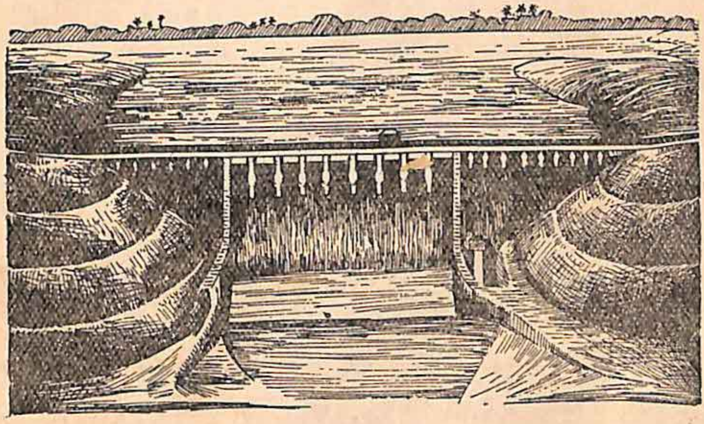
(wheel) বসাইয়া দিতে হয়। অথবা কোনও জলপ্রপাতকে মোটা নলের ভিতর চালাইয়া দিয়া তাহার নীচেও এইরকম চক্র বসান যায়। জলের বেগে সেই চক্র ঘুরিতে থাকে। সেই ঘূর্ণায়মান চক্রের অক্ষদণ্ডের (axle) সহিত ভূমির উপর অবস্থিত আর একটি চক্রের অক্ষদণ্ড যোগ করিয়া দিলে ভূমির উপরকার চক্রটিও ঘুরিতে থাকে। এইরূপে **জলচক্রের** (water-mill) সাহায্যে জল হইতে যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদন করা যায়। এই শক্তি হইতে নানাপ্রকার যন্ত্র চালান যায়। ইহার দ্বারা গম পেষা, বীজ হইতে তেল নিষ্কাশন করা ইত্যাদি শ্রমসাধ্য কাজ বিনা আয়াসে চালান যায়।

জল হইতে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করিতে হইলে উপরিউক্ত ঘূর্ণায়মান চক্রের সঙ্গে একটা ডাইনামো (dynamo) অথবা বিদ্যুৎ-উৎপাদক-যন্ত্র যোগ করিয়া দিতে হয়। তখন যান্ত্রিক শক্তি বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

নদী হইতে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করিতে হইলে নদীর জল উঁচু বাঁধ দিয়া ধরিয়া রাখিতে হয়। উঁচু বাঁধ হইতে সুড়ঙ্গ পথে জলকে নীচে নামিতে দিলে উহা খুব জোরে নামিয়া আসে। জল নামিবার পথে একটি টারবাইন (turbine) অর্থাৎ বহুপাখাযুক্ত চক্র বসান থাকে। জলের শক্তিতে টারবাইনটি ভীষণ বেগে ঘুরিতে থাকে। টারবাইনের সহিত একটি ডাইনামো যোগ করা থাকে। তাহাতে ডাইনামো চলিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়। টারবাইনে উৎপন্ন যান্ত্রিক শক্তিই বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। এই বিদ্যুৎ তারের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা যায় এবং বাড়ীতে ও শিল্পে কাজে লাগান যায়। নদী হইতে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাঁধ নির্মাণ এবং যন্ত্রপাতি বসাইবার খরচ ব্যতীত

বেশী খরচ করিতে হয় না। কারণ প্রতি বৎসরই বর্ষার সময় নদীতে জল হয় এবং সেই জলে বাঁধ ভরিয়া যায়। কয়লা পোড়াইয়াও বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়, কিন্তু তাহাতে সব সময়েই কয়লা খরচ হয়।

এইরূপ বাঁধ নির্মাণ করিয়া যে শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় তাহা নহে। যে জল টারবাইন ঘুরাইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করিল তাহা পরে কৃষিক্ষেত্রে সেচের কাজে লাগান যায়। আবার বর্ষার সময় বাঁধ দিয়া জলরাশি আবদ্ধ করিয়া রাখার জন্য নিম্নভূমিতে যে প্লাবন হইতে পারিত তাহাও রোধ করা যায়। এই জলাশয়ে মৎস্য-চাষ করিয়াও মাছের উৎপাদন বাড়ান যাইতে পারে।



১৭। কোনার বাঁধ

আমেরিকায় টেনেসী নদীর স্থানে স্থানে বাঁধ তৈয়ারী করিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি নানা জনহিতকর কার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। আমেরিকার Tennessee Valley Authority (T. V. A) এই কার্য পরিচালনা করিতেছেন। অনেকটা এই প্রণালীতেই ভারতে Damodar Valley Corporation

(D. V. C.) দামোদর নদ ও উপনদীর উপর বাঁধ বাঁধিয়া বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং প্রায় ৩০ লক্ষ বিঘা কৃষি-জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই পরিকল্পনার "কোনার" নামের যে বাঁধ তাহার চিত্র দেওয়া হইল (চিত্র ১৭)।

জল-শক্তি কী ?—জল-শক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় কিন্তু জলের পতন-শক্তি হইতেই জলের শক্তি আসে। পৃথিবীর মহাকর্ষের (gravity) জন্য জল উঁচু হইতে নীচুতে গড়াইয়া পড়ে এবং ইহার বেগই বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। সুতরাং জল-শক্তি হইতে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে তাহা পৃথিবীর মহাকর্ষ-শক্তিরই রূপান্তর।

তৃতীয় অধ্যায়

শক্তি

(Energy)

আমরা যে কোনও কাজ করি তাহাতে শক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। একটা বাক্স তুলিতে বা সামান্য এক টুক্‌রা পাথর কুড়াইতে শক্তির দরকার হয়। আমরা যে নড়াচড়া করি তাহাতেও শক্তির আবশ্যক। বলদ যে লাঙ্গল টানে, ঘোড়া যে গাড়ী টানে বা এঞ্জিন যে রেলগাড়ী টানে তাহাতেও শক্তি খরচ হয়। কোন কাজ করিতে বেশী বা কোন কাজ করিতে কম শক্তি ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু শক্তি ছাড়া কোনও কাজ হয় না। কাজ করিবার ক্ষমতাকেই **শক্তি** বলে।

শক্তির বিভিন্ন রূপ—শক্তি নানারূপে প্রকাশিত হইতে পারে। উপরে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল তাহা **চল-শক্তি** বা **গতি-শক্তির** উদাহরণ। কিন্তু চলশক্তি ছাড়া **তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ, চুম্বকত্ব, শব্দ,**

এ সবই শক্তির বিভিন্ন রূপ। কয়লা পোড়াইলে যে তাপের সঞ্চার হয় তাহার শক্তিতেই এঞ্জিন চলে। আলোর শক্তিতেই আমরা দেখিতে পাই। বিদ্যুতের শক্তিতে ট্রামগাড়ী চলে ও বাতি জ্বলে। চুম্বকের আকর্ষণ-শক্তির জন্যই চুম্বক লোহার টুক্‌রা টানিয়া রাখিতে পারে। শব্দ করিয়া ঘুমন্ত লোককে জাগান যায়। গোলাগুলির বিস্ফোরণে যে শব্দ হয় তাহা এত শক্তিশালী হইতে পারে যে তাহাতে কানের পর্দাও ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।

শক্তির রূপান্তর—উপরে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল তাহাতে ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে শক্তির একরূপ আর একরূপে পরিবর্তিত হইতে পারে। যেমন, কয়লা পোড়াইলে উহার **রাসায়নিক শক্তি** তাপ-শক্তিতে পরিণত হয় এবং এই তাপ-শক্তি এঞ্জিনের চল-শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। বিদ্যুতের শক্তি ট্রামগাড়ীর চল-শক্তিতে ও বৈদ্যুতিক বাতির আলোতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে, ফটোইলেকট্রিক সেল (photo-electric cell) ব্যবহার করিয়া আলোককে বিদ্যুতে পরিবর্তিত করা যায়। শীত পড়িলে আমরা অনেক সময় হাতে হাত ঘষিয়া থাকি। এখানে হাত ঘষার চল-শক্তি তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে। একটা বল মেঝের উপর ফেলিয়া দিলে শব্দ হয়। এস্থলে বলের স্থৈতিক শক্তি (potential energy) উহার চল-শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে এবং চল-শক্তি শব্দ-শক্তিতে পরিণত হইতেছে। চুম্বক ব্যবহার করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার করিয়া লোহাকে চুম্বক-শক্তি দেওয়া যায়। **সমস্ত জগতে সব সময়েই একরূপ শক্তি আর একরূপ শক্তিতে পরিবর্তিত হইতেছে। কিন্তু ইহাতে শক্তির কোনও ক্ষয় বা বৃদ্ধি নাই ; শক্তির রূপান্তর ঘটিতেছে মাত্র।**

শক্তির উৎস—এই সব রকম শক্তিরই মূল উৎস দুইটি ; একটি আমাদের সূর্য আর একটি পৃথিবীর মহাকর্ষ। সূর্যের আলো ও তাপ গ্রহণ করিয়াই সব জীব বাঁচিয়া থাকে। সূর্যের শক্তি জীব ব্যবহার করে এবং শরীরের উপাদানের মধ্যে রাসায়নিক শক্তিরূপে সঞ্চয় করে। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মৃত্যু হইলে এবং বহুকাল ধরিয়া উহার উপর মাটির অনেক চাপ পড়িলে উহা কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি পদার্থে পরিণত হয়। এই কয়লা ও পেট্রোলিয়াম পোড়াইলে তাপ নির্গত হয়। অতএব এই তাপ-শক্তির উৎস সেই সূর্য, যাহার তাপ-শক্তি ও আলোক-শক্তি এই সব পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক শক্তিরূপে নিহিত ছিল। আবার কয়লা দহন করিয়া বয়েলার ও ডাইনামোর সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। অতএব এই বিদ্যুৎ-শক্তির উৎস হইল সূর্য। আবার বিদ্যুৎকে তাপ ও চল-শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। বিদ্যুতের সাহায্যে লোহাকে চুম্বকে পরিণত করা যায়। অতএব সূর্য হইল এই তাপ-শক্তি, চল-শক্তি ও চৌম্বক শক্তির উৎস।

আমরা আগেই দেখিয়াছি যে জলপ্রপাত হইতে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। তাহাতে কোনও তাপের দরকার হয় না। এই জল-বিদ্যুৎ জলপ্রপাতের চল-শক্তির রূপান্তর এবং জলপ্রপাতের চল-শক্তি পৃথিবীর মহাকর্ষ শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। এই মহাকর্ষ-শক্তিই উপরিস্থিত জলে উহার স্থৈতিক শক্তি (potential energy) রূপে বর্তমান ছিল। সেইজন্য পৃথিবীর মহাকর্ষই জলবিদ্যুৎ-শক্তির উৎস।

আমরা চলিয়া ফিরিয়া ও কাজ করিয়া শক্তি ব্যয় করিতেছি। সেই শক্তি আমরা খাদ্য হইতে পাইতেছি। একদিন না খাইলেই শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং কয়েকদিন উপবাস দিলে চলার শক্তি প্রায় লোপ পায়। খাদ্য শরীরে ধীরে ধীরে দগ্ধ হয়। তাহাতে

উহার রাসায়নিক শক্তি তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং এই তাপ-শক্তি আমাদের জীবনধারণের, চলাফেরার ও কাজকর্ম করার শক্তিতে পরিণত হয়। এই খাদ্য আমরা উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজাত দ্রব্য দুধ, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি হইতে পাই। প্রাণীরাও তাহাদের খাদ্য উদ্ভিদ্ হইতে পাইয়া থাকে। সেইজন্য আমাদের খাদ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ্ হইতেই আসে। এই উদ্ভিদ্ সূর্যের আলো ও তাপের সাহায্যেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও ফসল উৎপন্ন করে। যখন আমরা এই ফসল খাদ্যরূপে গ্রহণ করি তখন আমরা পরোক্ষভাবে সূর্যের কাছে ঋণী। এই খাদ্য শরীরে দগ্ধ করিয়া যখন আমরা বাঁচিয়া থাকার ও কাজকর্ম করার শক্তি পাই, তখন মনে রাখিতে হইবে এই সব শক্তির উৎস হইল সেই সূর্য।

যন্ত্র বা কল (machines)—প্রকৃতিতে শক্তির ছড়াছড়ি, কিন্তু ইহা কাজে লাগাইতে হইলে যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। যেমন নদীতে জলের ছড়াছড়ি, কিন্তু বাড়ীতে জলের আবশ্যক হইলে কলসী ভরিয়া আনিতে হয়।

কয়লা, কেরোসিন, পেট্রোল প্রভৃতি দাহ্য বস্তুর মধ্যে রাসায়নিক শক্তি আছে। ইহারা জ্বলিলে সেই শক্তি তাপ রূপে বাহির হইয়া আসে। সেই তাপ হইতে শক্তি পাইতে হইলে কয়লাকে বয়েলারের (boiler) নীচে জ্বালাইতে হয়। বয়েলারে জল থাকে ; কয়লার তাপে তাহা ফুটিয়া বাষ্প বা ষ্টীম (steam) হয়। ইহাতে তাপ-শক্তি বাষ্পের স্থৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সেই বাষ্প জোরে প্রসারিত (expanded) হইলে যে চল-শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাতে রেলগাড়ী, জাহাজ প্রভৃতি বড় বড় যানবাহন চলিয়া থাকে। যে যন্ত্র বাষ্প বা ষ্টীমের সাহায্যে চলে তাহাকে ষ্টীম এঞ্জিন (steam

engine) বলে। আবার পেট্রোল জ্বালাইয়া মোটর গাড়ীর ও এরোপ্লেনের এঞ্জিন চালান হয়। ইহাকে পেট্রোল এঞ্জিন (petrol engine) বলে। ক্রুড অয়েল (crude oil) জ্বালাইয়াও ইঞ্জিন চালান হয়। এই এঞ্জিনের আবিষ্কারকের নামে ইহাকে ডিজেল এঞ্জিন (Diesel engine) বলে। পেট্রোল ও ডিজেল এঞ্জিনে দাহ্যবস্তু পুড়িয়া গরম বাষ্প ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈয়ারী করে। তাহাদের প্রসারণের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহাতেই এই এঞ্জিন চলিতে থাকে। এইরূপে যন্ত্রের সাহায্যে তাপ-শক্তি (heat energy) যান্ত্রিক চল-শক্তি বা গতি-শক্তিতে (mechanical energy) রূপান্তরিত হয়।

ঘড়ির কল (clock-work)—ঘড়িও একটি যন্ত্র। ইহাতে ইস্পাতের স্প্রিং (spring) থাকে। দম দিলে স্প্রিং গুটাইয়া সঙ্কুচিত হয়। দম দিতে যে জোর লাগে সেই শক্তি এই গুটান স্প্রিংএর মধ্যে স্থৈতিক শক্তিরূপে নিহিত থাকে। তারপর তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তাহার প্রসারণের শক্তি হইতে ঘড়ির কাঁটা চলে। এই প্রসারণের শক্তি ও ঘড়ির কাঁটা চলার শক্তি গুটান-স্প্রিংএর স্থৈতিক শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। এইরূপে স্প্রিং যখন একেবারে প্রসারিত হইয়া যায় তখন আর ঘড়ি চলিতে পারে না। সেইজন্য ঘড়িতে নিয়মিত দম দিতে হয়।

জড়-যন্ত্র ও জীবন্ত-যন্ত্র—জীবের শরীরকে যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। ইহারা যেন এক একটি জীবন্ত যন্ত্র (living machine)। জড় যন্ত্রগুলি (রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী প্রভৃতি) যেরূপ কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি পোড়াইয়া তাহার শক্তিতে চলে, সেইরূপ জীবের শরীরও খাদ্য ব্যবহার করিয়া তাহার শক্তিতে কাজ করে।

কয়লা বা পেট্রোল ফুরাইয়া গেলে যেমন রেলগাড়ী বা মোটর গাড়ী আর চলিতে পারে না, তেমনি খাদ্য না পাইলে শরীর আর চলিতে পারে না। এঞ্জিনের কয়লা বা পেট্রোল পুড়িয়া বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প সৃষ্টি করে। তেমনি শরীরের খাদ্য পুড়িলেও ঐ দুই বস্তু তৈয়ারী হয়। সেইজন্য একই প্রণালীতে জড়যন্ত্র ও জীবযন্ত্র শক্তি আহরণ করে।

জড়যন্ত্র ও জীবযন্ত্রের তুলনা (Machines and living machines compared)—জড়যন্ত্রের সঙ্গে জীব-যন্ত্রের কিছু প্রভেদ আছে। দাহ্যবস্তু জড়যন্ত্রের অঙ্গীভূত হয় না। উহা আলাদা থাকে এবং আলাদা থাকিয়াই দগ্ধ হয় ও যন্ত্রকে চালায়। কয়লা বা পেট্রোল না পাইলেও এঞ্জিন নষ্ট হয় না। কয়লা বা পেট্রোল দিলে উহা আবার কাজ করিতে আরম্ভ করে। জীবের শরীরের বেলায় কিন্তু তাহা খাটে না। খাদ্য পরিপাক ও আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা উহা শরীরের অঙ্গীভূত হয়। এই কারণে খাদ্যের অভাবে শরীর যে শুধু কাজ করিতে পারে না তাহা নহে, নিজেই বিনষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য খাদ্যাভাবে জীব শুধু চলিতে নয়, বাঁচিতেই পারে না। এই বিষয়ে জড়যন্ত্র অপেক্ষা জীবযন্ত্র বেশী জটিল। জড়যন্ত্রের ও জীবযন্ত্রের আর একটা প্রভেদ এই যে জড়যন্ত্রে দাহ্যবস্তু সাধরণতঃ তাড়াতাড়ি পুড়িয়া যায় এবং তাহাতে বেশী উত্তাপের সৃষ্টি হয়। জীবযন্ত্রে খাদ্য ধীরে ধীরে পুড়িয়া থাকে। সেইজন্য শরীর সকল সময়ে সামান্যই গরম থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

তাপ

(Heat)

তাপ একপ্রকার শক্তি। উহার প্রয়োগে পদার্থ গরম হয়। কোন নির্দিষ্ট পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ কত বেশী গরম, তাহার আপেক্ষিক পরিমাণকে তাপের মাত্রা (temperature) বলে।

ঠাণ্ডা ও গরম বলিতে কি বুঝায় তাহা সকলেই জানে। জিনিস গরম করিতে হইলে, আমরা সাধারণতঃ উহাকে রৌদ্রে দিই কিংবা আগুনের উপর ধরি। খুব বেশী গরম জিনিসের সংস্পর্শে আনিয়াও কোন কোন জিনিসকে গরম করা যায়। আবার বরফের মত খুব ঠাণ্ডা জিনিস লাগাইলে গরম জিনিসও ঠাণ্ডা হইয়া যায়। গ্রীষ্মকালে সেইজন্য আমরা অনেক সময় জল বরফ দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া খাই।

জল যেমন উঁচু হইতে নীচুতে গড়াইয়া যায়, তেমনি তাপও গরম হইতে ঠাণ্ডা জিনিসে প্রবাহিত হয়। তাপ আমরা চোখে দেখিতে পাই না। বরফে হাত দিলে আমরা হাতে ঠাণ্ডা বোধ করি। তাহার কারণ, তাপ আমাদের হাত হইতে বরফে প্রবাহিত হয়। আবার গরম জলে হাত দিলে আমরা গরম বোধ করি, কারণ তাপ জল হইতে হাতে আসিয়া হাতকে গরম করে।

একটা গরম বস্তু একটা ঠাণ্ডা বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে, তাপ গরম বস্তু হইতে ঠাণ্ডা বস্তুতে প্রবাহিত হয়। সেইজন্য গরম বস্তু ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইতে থাকে ও ঠাণ্ডা বস্তু গরম হইতে থাকে। অবশেষে দুই বস্তুর তাপের মাত্রা এক অর্থাৎ মাঝামাঝি হয়। খুব গরম জল ঈষদুষ্ণ করিতে হইলে তাহাকে ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে হয়।

তাপের উৎপত্তি—সূর্য একটি প্রাকৃতিক তাপ-শক্তির উৎস। উহার মধ্যে অনেক বস্তু গ্যাসীয় অবস্থায় বর্তমান আছে। উহা হইতে যে প্রচণ্ড তাপ ও আলোক বিকীর্ণ হয় তাহাতে পৃথিবী ও সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহ তাপ ও আলোক পাইয়া থাকে। সূর্যের মধ্যে যে সকল বস্তু আছে তাহাদের রাসায়নিক ও আণবিক শক্তিই তাপ ও আলোকে রূপান্তরিত হয়।

বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে তাপ উৎপন্ন করা যায়। কোনও সরু তামার তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইলে উহা গরম হইয়া উঠে। তাহাতেই বুঝা যায় যে বিদ্যুৎ তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে। এই তাপের সাহায্যে অনেক কাজ করা যায়। শীতপ্রধান দেশে এইরূপ তাপপ্রদানকারী বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহার করিয়া ঘর গরম করা হয়। সেইজন্য অনেকে বাড়ীতে বৈদ্যুতিক চুলা ব্যবহার করে।

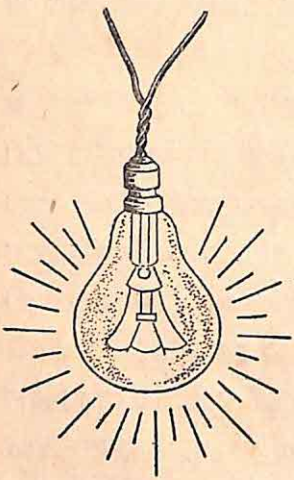
চল-শক্তিও তাপে রূপান্তরিত হইতে পারে। যন্ত্রপাতি শান দিবার সময় যন্ত্র এত গরম হয় যে আগুনের ফুল্‌কি বাহির হয়। হাতে হাত ঘর্ষণ করিলেও হাত গরম হইয়া যায়। পাথরে পাথর ঠুকিলেও আগুন বাহির হইয়া থাকে।

পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া হইতেও তাপের উদ্ভব হয়। বারুদের মধ্যে কাঠকয়লা, গন্ধক, সোরা প্রভৃতি দ্রব্যের মিশ্রণ থাকে। বারুদে সামান্য আগুন দিলে এই সকল দ্রব্যের রাসায়নিক সংযোগে খুব তাপ বাহির হয়। এখানেও বারুদের রাসায়নিক শক্তি তাপ-শক্তিতে পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

তাপের কার্য বা প্রভাব (Effects of heat)—তাপের ফলে বস্তুর কতকগুলি পরিবর্তন দেখা যায়। তাপের আধিক্য হইলে বস্তু ভাস্বর (incandescent) হইয়া উঠে, দাহ্যবস্তু হইলে জ্বলিয়া

(burning) উঠে এবং বস্তুর আয়তন (size) ও অবস্থার (state) পরিবর্তন হইয়া থাকে।

(১) **তাপে বস্তু ভাস্বর হয়**—লোহা হাপরে গরম করিলে যখন খুব গরম হয় তখন ইহার বর্ণ উজ্জ্বল লাল দেখায়। উহা যত বেশী গরম হইতে থাকে তত বেশী উহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। বৈদ্যুতিক বাতির তার বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে গরম হইয়া এইরূপ উজ্জ্বল হয় (চিত্র ১৮)। সেইজন্য বাতি হইতে তাপ ও আলো বিকীর্ণ হইয়া থাকে।

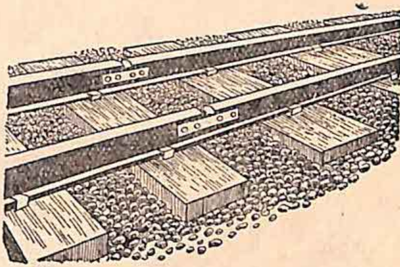


১৮। বৈদ্যুতিক আলো

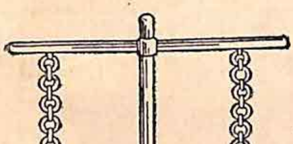
(২) **তাপ পাইলে দাহ্য বস্তু জ্বলিয়া উঠে**—দাহ্য বস্তুর দহনের সময় বাতাসের অক্সিজেনের সহিত উহার রাসায়নিক সংযোগ হয়। দাহ্য বস্তুকে জ্বালাইবার জন্য প্রথমে কিছু তাপ দিতে হয়। নহিলে দাহ্য বস্তু সাধারণতঃ জ্বলিতে পারে না। তাপ দিয়া একবার জ্বালাইয়া দিলে বাতাসের অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক সংযোগে যে তাপ বাহির হইতে থাকে তাহা জ্বলন কার্যকে চালাইতে থাকে। এইভাবে তাপ প্রদান করিলে কাঠ, কয়লা, কেরোসিন, পেট্রোল ইত্যাদি জ্বলিয়া উঠে।

(৩) **তাপে পদার্থের আয়তনের পরিবর্তন হয়**—তাপ দিলে জিনিস গরম হইয়া উঠে। গরম হইলে প্রায় সকল জিনিসেরই আয়তন বৃদ্ধি (সম্প্রসারণ) হয়। রেল লাইনের রেলগুলি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, রেলের মাঝে মাঝে একটু ফাঁক থাকে (চিত্র ১৯)। গ্রীষ্মকালে লোহার রেল গরম হইয়া লম্বায়

বড় হয়। এই ফাঁকটুকু না থাকিলে রেল লাইন বাঁকিয়া যাইত। উত্তপ্ত হইলে কঠিন পদার্থের যে আয়তন বৃদ্ধি হয়, তাহা সহজেই পরীক্ষা করা যায়। এমন একটা পিতলের বল লইতে হইবে যাহা ঠাণ্ডা অবস্থায় একটি আংটির (ring) মধ্য দিয়া গলিয়া যায়, অথচ আংটি যেন বল হইতে বেশী বড় না হয়। এখন যদি পিতলের বলটিকে খুব গরম করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে বলটিকে আর আংটির মধ্য দিয়া গলান যায় না। গরম হইয়া বলটির আয়তন বড় হইয়া গিয়াছে। ঠাণ্ডা হইলে বলটি আবার আগের মত ছোট হইয়া যাইবে ও পুনরায় আংটির মধ্য দিয়া গলিয়া যাইবে (চিত্র ২০)।



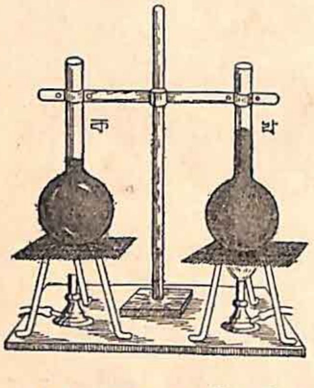
১৯। রেল লাইনের মাঝে মাঝে ফাঁক থাকে



২০। তাপে পিতলের বলটির আয়তন বাড়িয়াছে

কঠিন পদার্থ অপেক্ষা তরল পদার্থ অনেক বেশী সম্প্রসারিত হয়, আর বায়বীয় পদার্থের আয়তন বাড়ে সবচেয়ে বেশী। তরল পদার্থ গরম হইলে আয়তনে বাড়ে, তাহা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। একটি লম্বা নলবিশিষ্ট কাচের গোলকে রঙীন জল ভরিয়া গোলকটিকে আস্তে আস্তে গরম করিলে দেখা যাইবে যে জল গরম হইয়া ধীরে ধীরে নলের ভিতর দিয়া উঠিতেছে (চিত্র ২১, ক-খ)। জল যতই গরম হইবে ততই উহা আয়তনে বাড়িবে এবং অনেক বেশী

জায়গা জুড়িয়া থাকিবে। ঠাণ্ডা হইলে জলের উচ্চতা কমিয়া উহা আবার পূর্বের সমান হইবে। তোমরা হয়ত জিজ্ঞাসা করিবে, গরম হইলে গোলকটিও আয়তনে বড় হইবে, তবে জলের লেভ্‌ল (level, জলসম) উঠিবে কেন? খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, সত্যই প্রথমে জলের লেভ্‌ল না উঠিয়া বরং একটু নামিয়া যায়, তারপর জল যতই গরম হইতে থাকে ততই লেভ্‌ল উঁচুতে উঠিতে থাকে। ইহার কারণ এই যে গরম করিবার সময় গোলকটি প্রথমে গরম হয়; জল গরম হইতে একটু সময় লাগে। গোলকটি গরম হইলে তাহার আয়তন বড় হয়, তখনও জলের আয়তন প্রায় পূর্বের মতই থাকে। ফলে জলের লেভ্‌ল নামিয়া যায়। তাহার পর যখন গোলক ও জল উভয়ই গরম হইতে থাকে, তখন গোলকের আয়তন অপেক্ষা জলের আয়তন ঢের বেশী বাড়িয়া যায়, ফলে জলের লেভ্‌ল উঠিতে থাকে।



২১। গরম জল ধীরে ধীরে নলের ভিতর দিয়া উঠিতেছে (খ)

সমান উত্তাপের ফলে ভিন্ন ভিন্ন কঠিন ও তরল পদার্থ সমান ভাবে প্রসারিত হয় না। তাহাদের বিভিন্ন মাত্রায় আয়তনের বৃদ্ধি হয়। লোহা, রূপা, তামা, জল, পারা প্রভৃতির প্রতি সমান মাত্রায় উত্তাপ প্রয়োগ করিলেও ইহাদের আয়তন সমানভাবে বাড়িবে না। কোন্ বস্তু কতখানি বাড়িবে তাহা তাহার নিজের ধর্ম।

গ্যাসকেও উত্তপ্ত করিলে উহা সর্বাপেক্ষা বেশী আয়তনে বৃদ্ধি পায়। বাতাসে ভরা একটা কাচের পাত্র মুখ বন্ধ করিয়া গরম করিলে

বাতাসের আয়তন এত বাড়ে যে, পাত্রটি সশব্দে ফাটিয়া যাইতে পারে।

(৪) **তাপে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন হয়**—কোন জিনিসকে তাপ দিলে উহার অবস্থারও পরিবর্তন হয়। বস্তু তিন অবস্থায় থাকিতে পারে—**কঠিন, তরল** ও **বায়বীয়**। তাপ প্রদান করিলে সাধারণতঃ কঠিন বস্তু প্রথম তরল হয় ও পরে উহা বায়বীয় পদার্থ বা গ্যাসে পরিণত হয়। বরফকে গরম করিলে জল হয়। তাহাকে আরও গরম করিলে জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তেমনি বাষ্পকে ঠাণ্ডা করিলে প্রথমে জল হয় এবং আরও ঠাণ্ডা করিলে উহা বরফে পরিণত হয়। পারা একটি তরল ধাতু। ফুটাইলে ইহাও বাষ্পে পরিণত হয় এবং তাহা ঠাণ্ডা করিলে আবার তরল হইয়া যাইবে। বায়বীয় পদার্থকে তরল করিতে হইলে ঠাণ্ডার সঙ্গে চাপ দিলে উহাকে তরল করা সহজ হয়। এই রকম উপায়ে বায়ুকে তরল করা গিয়াছে। তরল বায়ু অত্যন্ত ঠাণ্ডা। গরম জল হাতে পড়িলে যেমন ফোস্কা পড়ে, অতি ঠাণ্ডা এই তরল বায়ু হাতে পড়িলেও সেইরকম ফোস্কা পড়ে। ইহার কারণ, গরম জল হইতে তাপ হাতে প্রবেশ করিয়া হাতকে আহত করে; আবার খুব ঠাণ্ডা তরল বায়ুতে হাত পড়িলে হাত হইতে তাপ উহার মধ্যে সঞ্চালিত হয় এবং হাতের তাপ-হানির ফলে হাত জখম হয়।

কোন কোন কঠিন পদার্থকে গরম করিলে উহা তরল না হইয়া একেবারেই বায়বীয় হইয়া যায়, যেমন, কর্পূর। আয়োডিন বলিয়া একটি পদার্থ আছে। উহাকেও গরম করিলে উহা তরল না হইয়া বেগুনী রঙের গ্যাস হইয়া যায়। সেই বেগুনী রঙের ধোঁয়ার উপর

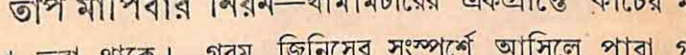
একটি ঠাণ্ডা বাটি ধরিলে বাটির তলায় ঠাণ্ডা লাগিয়া আয়োডিনের বাষ্প পুনরায় জমাট বাঁধিয়া যায়।

সকল বস্তুই অসংখ্য অণুর দ্বারা গঠিত। এই অণুগুলি সব সময়েই স্পন্দিত (vibrating) অবস্থায় থাকে। কঠিন বস্তুতে অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ বেশী থাকে। তরল বস্তুতে অণুগুলির আকর্ষণ ও বিকর্ষণ সমান এবং বায়বীয় বস্তুতে বিকর্ষণ বেশী হয়। সেইজন্য কঠিন বস্তুর আকার বা আয়তন সহজে পরিবর্তন করা যায় না; অণুগুলি পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তরল পদার্থের অণুগুলি সহজেই একটার উপর আর একটা গড়াইয়া যায়। সেইজন্য তরল পদার্থের আকার অনায়াসেই পরিবর্তন করা যায়। উহা যে পাত্রে থাকে তাহারই আকৃতি ধারণ করে। যেমন গ্লাসে বা বাটিতে রাখিলে উহা গ্লাস বা বাটির আকারই ধারণ করিবে কিন্তু উহার আয়তনের পরিবর্তন হইবে না। বায়বীয় পদার্থের মধ্যে অণুগুলির পরস্পর বিকর্ষণ এত বেশী যে উহার আকার ও আয়তন দুইই সহজে পরিবর্তন করা যায়। একটা গ্যাস একটা ছোট লোহার পিপার মধ্যেই রাখা হউক বা একটা বড় ঘরের মধ্যেই ছাড়িয়া দেওয়া হউক উহা সেই পিপার বা ঘরের আকৃতি ও আয়তন গ্রহণ করিবে।

তাপ দিলে তাপ চল-শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া অণুগুলির স্পন্দন বাড়াইয়া দেয় এবং তাহাতে উহাদের বিকর্ষণ বাড়ে। সেইজন্য কঠিন পদার্থ গরম করিলে উহার অণুগুলি আরও স্পন্দিত হয় এবং বিকর্ষণ বাড়িবার ফলে উহা তরল পদার্থে পরিণত হয়। আরও গরম করিলে অণুগুলির স্পন্দন ও বিকর্ষণ এত বাড়ে যে তরল পদার্থ বায়বীয় পদার্থে রূপান্তরিত হয়। **বস্তুর অবস্থা তাপজনিত অণুগুলির স্পন্দন ও বিকর্ষণের জন্যই হইয়া থাকে।**

থার্মমিটার—(Thermometer)

তাপের মাত্রা—কোন জিনিস ঠাণ্ডা কিংবা গরম তাহা আমরা স্পর্শ করিয়াই অনেক সময়ে মোটামুটি বুঝিতে পারি, কিন্তু একটি জিনিস আর একটি জিনিস অপেক্ষা কতটা বেশী গরম কিংবা ঠাণ্ডা তাহা সঠিক বুঝিতে পারি না। যদি এক হাত বরফে ও আর এক হাত গরম জলে রাখিয়া এবং দুই হাতই পুনরায় এক বাল্‌তি ঈষদুষ্ণ জলে ডুবান যায়, তবে একই জলকে ঠাণ্ডা হাতে গরম ও গরম হাতে ঠাণ্ডা মনে হইবে। যে যন্ত্রের সাহায্যে জিনিসের তাপের মাত্রা (temperature) কত তাহা সঠিক ভাবে মাপা যায়, তাহাকে **উষ্মমাপক যন্ত্র** বা **থার্মমিটার** (thermometer) বলে (চিত্র ২২)। জ্বর হইলে থার্মমিটার বগলে দিয়া আমরা দেহের উত্তাপ নির্ণয় করি। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর তাপের মাত্রা নিরূপণ করার জন্য নানাবিধ থার্মমিটার ব্যবহৃত হয়।

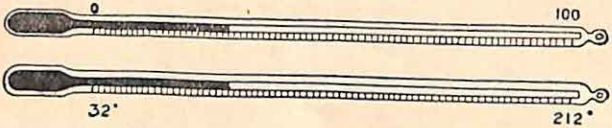


২২। থার্মমিটার বা উষ্মমাপক যন্ত্র

তাপ মাপিবার নিয়ম—থার্মমিটারের একপ্রান্তে কাচের মধ্যে পারা ভরা থাকে। গরম জিনিসের সংস্পর্শে আসিলে পারা গরম হইয়া আয়তনে বৃদ্ধি পায় ও থার্মমিটারের সরু নলের মধ্য দিয়া উঠিতে থাকে। থার্মমিটারের গায়ে দাগ কাটা থাকে। সেই দাগ বা স্কেলের (scale) সাহায্যে আমরা বস্তুর উত্তাপের মাত্রা নির্ণয় করি।

থার্মমিটারের স্কেল কি করিয়া তৈয়ারী হয়? প্রথমতঃ থার্মমিটারের মধ্যে পারা ভরিয়া তাহা বরফের মধ্যে দাঁড় করিয়া রাখা হয়।

এই বরফের মধ্যে যেন মোটেই লবণ না থাকে; লবণযুক্ত বরফের তাপমাত্রা আরও কম। বরফের ঠাণ্ডায় পারা সংকুচিত হইয়া প্রায় ইহার স্ফীত অংশটির কাছে নামিয়া আসিবে। তখন পারার মাথার কাছে একটা দাগ দেওয়া হয়। এই দাগকে 0° শূন্য ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড (centigrade) বলা হয়। তাহার পর থার্মমিটারটি ফুটান জলের বাষ্পে রাখা হয়। পারা গরম হইয়া নলের মধ্য দিয়া উঠিতে থাকিবে।



২৩। সেন্টিগ্রেড (উপরে) ও ফারেনহাইট (নীচে) থার্মমিটার

যখন দেখা যাইবে পারা আর উঠিতেছে না, স্থির হইয়া আছে, তখন তাহার মাথায় আর একটি দাগ কাটা হয়। এই দাগ হইতেছে ১০০° একশত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের দাগ (চিত্র ২৩)। কাচের নলের এই দুই দাগের মাঝের অংশটিকে একশত সমভাগে ভাগ করা হয়। যে কোন দুইটি দাগের দূরত্ব হইতেছে ১° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। মনে রাখিতে হইবে যে বরফ 0° সেন্টিগ্রেডে গলে, ও জল ১০০° সেন্টিগ্রেডে ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হয়। থার্মমিটারকে কোন গরম জিনিসের গায়ে লাগাইলে পারা গরম হইয়া ক্রমশঃ উঠিয়া যে দাগের কাছে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইবে, সেই দাগটিই হইতেছে ঐ গরম জিনিসের তাপের মাত্রা।

জ্বর হইলে আমরা যে থার্মমিটার ব্যবহার করি তাহার ডিগ্রী কিন্তু এই ডিগ্রীর সমান নহে। ১০০° ডিগ্রীর জ্বর সামান্যই জ্বর। তখন গায়ের উত্তাপ যাহা হইবে তাহাতে জল ফুটিবে না, ইহা বলাই বাহুল্য। জ্বর **ফারেনহাইট** স্কেল-এ (Fahrenheit scale) মাপা হয়। এই স্কেল ২১২° ডিগ্রীতে বিভক্ত (চিত্র ২৩)। ইহার ৩২° ডিগ্রীতে

বরফ গলে এবং ২১২° ডিগ্রীতে জল ফুটিয়া বাষ্প হয়। অতএব যে তাপের মাত্রা সেন্টিগ্রেড স্কেলে 0° ডিগ্রী তাহা ফারেনহাইট স্কেলে ৩২° ডিগ্রী এবং যে তাপের মাত্রা সেন্টিগ্রেড স্কেলে ১০০° ডিগ্রী, তাহা ফারেনহাইট স্কেলে ২১২° ডিগ্রী। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সদ্য গলা বরফ হইতে ফুটন্ত জলের ব্যবধান সেন্টিগ্রেড স্কেলে ১০০ − 0 = ১০০° ডিগ্রীতে বিভক্ত; কিন্তু ফারেনহাইট স্কেলে উহা ২১২ − ৩২ = ১৮০° ডিগ্রীতে ভাগ করা থাকে। সেন্টিগ্রেড ডিগ্রীকে ফারেনহাইট ডিগ্রীতে প্রকাশ করিতে হইলে সেন্টিগ্রেড ডিগ্রীকে $\frac{৯}{৫}$ দিয়া গুণ করিয়া ৩২ যোগ করিতে হয়। আবার ফারেনহাইট ডিগ্রীকে সেন্টিগ্রেড ডিগ্রীতে প্রকাশ করিতে হইলে ফারেনহাইট ডিগ্রী হইতে ৩২ বাদ দিয়া $\frac{৫}{৯}$ দিয়া গুণ করিতে হয়।

অবশ্য জ্বর মাপিবার থার্মমিটারে সমস্ত ফারেনহাইট স্কেলটা দেওয়া হয় না। উহাতে শুধু ৯৫° ডিগ্রী হইতে ১১০° ডিগ্রীর চিহ্ন দেওয়া থাকে। জ্বর না থাকিলে আমাদের শরীরের উত্তাপ সাধারণতঃ ৯৮·৪° ডিগ্রীতে থাকে। এই স্থলে থার্মমিটারে এইরূপ ↑ একটি তীর চিহ্ন দেওয়া থাকে (চিত্র ২২)। জ্বর হইলে পারার রেখা এই দাগ ছাড়াইয়া স্কেলে উঠিতে থাকে। যে দাগ পর্যন্ত উহা উঠিয়া থামিয়া যায় তাহা দেখিয়া জ্বরের মাত্রা নির্ণয় করা হয়। জ্বর মাপিবার এই থার্মমিটারকে ক্লিনিকাল (clinical) থার্মমিটার কহে।

তাপ সঞ্চারণ

গরম বস্তু হইতে ঠাণ্ডা বস্তুতে তাপ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। তাপ সঞ্চারণ তিন প্রকারে হইতে পারে ; যথা—**পরিবহণ** (Conduction), **পরিচলন** (Convection) ও **বিকিরণ** (Radiation)।

তাপ পরিবহণ—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বস্তু উত্তপ্ত হইলে উহার অণুগুলির স্পন্দন বেশী হয়। তপ্ত বস্তুর অণুর স্পন্দন ঠাণ্ডা বস্তুর অণুর মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং তাহার অণুকেও বেশী স্পন্দিত করে। সেইজন্য ঠাণ্ডা বস্তু গরম হইয়া উঠে। কঠিন বস্তুর অণুসকল তাপে স্পন্দিত হইলেও পরস্পর আকর্ষণের জন্য নিজের স্থান পরিবর্তন করিতে পারে না। স্থান পরিবর্তন না করিয়া তপ্ত অণুগুলি উহাদের পার্শ্বস্থিত ঠাণ্ডা অণুগুলির মধ্যে তাপ সঞ্চারিত করে। কঠিন বস্তুর মধ্যে এইরূপে তাপ সঞ্চারণ হইয়া থাকে। এইরূপ তাপ সঞ্চারণকে **তাপের পরিবহণ** বলে। ইহা কঠিন বস্তুরই বৈশিষ্ট্য।

সকল কঠিন বস্তুর তাপ পরিবহণ ক্ষমতা সমান নহে। ধাতুর তাপ পরিবহণ ক্ষমতা বেশী; যেমন, তামা, লোহা, সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম, এ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি। ইট, কাঠ, পাথর, কাচ, এ্যাস্‌বেস্‌টস, পশম, বাতাস প্রভৃতি পদার্থের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা কম। যাহাদের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা বেশী তাহারা শীঘ্র গরম এবং ঠাণ্ডা হয়। যাহাদের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা কম তাহাদের গরম হইতেও দেরী হয় এবং ঠাণ্ডা হইতেও সময় লাগে।

তাপ পরিচলন—তরল ও বায়বীয় পদার্থের অণুতে অণুতে আকর্ষণ কম থাকে। সেইজন্য এই সকল পদার্থ গরম হইলে গরম অণুগুলি হাল্‌কা হইয়া সহজেই উপরে উঠিয়া যায় এবং উপর হইতে ভারী এবং ঠাণ্ডা অণুগুলি নামিয়া আসে। তাহারা গরম হইয়া আবার উপরে উঠিয়া যায়। এইরূপে তাপ পাইয়া অণুগুলি সর্বদা স্থান পরিবর্তন করে। উহার ফলে তরল ও বায়বীয় পদার্থের সমস্ত স্থানে তাপ সঞ্চারণ হয়। ইহাকে **তাপের পরিচলন** বলে। তরল ও বারবীয় পদার্থের মধ্যে তাপের পরিচলন হইয়া থাকে। তরল পদার্থের তাপ

পরিবহণ ক্ষমতা খুব কম এবং বায়বীয় পদার্থের আরও কম। পক্ষান্তরে কঠিন বস্তুতে তাপের পরিচলন হয় না, পরিবহণ হইয়া থাকে।

তাপ বিকিরণ—দূরে অবস্থিত গরম বস্তু উহার তাপের দ্বারা ঠাণ্ডা বস্তুকে গরম করিতে পারে। ইহার কারণ সেই গরম বস্তু তাপ-বিকিরণ করে। গরম বস্তু হইতে তাপের রশ্মি সকল দিকে সরলরেখায় বিকীর্ণ হয়। ইহা যে মাধ্যমের (medium) ভিতর দিয়া আসে তাহাকে গরম করে না। যখন কোন বস্তু উহার দ্বারা বাধা পায় তখন উহা সেই বস্তুকে গরম করে। সূর্য পৃথিবী হইতে প্রায় ১০ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। তথাপি সূর্যের তাপে পৃথিবী গরম হয়। সূর্য হইতে চতুর্দিকে বিকীর্ণ তাপরশ্মির কিয়দংশ মাত্র পৃথিবীতে পড়ে। এই সকল বিকীর্ণ রশ্মি বাতাসের দ্বারা কিছু বাধা পায় বলিয়া বাতাসও অল্প গরম হয়। উর্ধ্বের হাল্কা বাতাস নীচের ঘন বাতাস অপেক্ষা তাপরশ্মিকে কম বাধা দেয় বলিয়া উর্ধ্বের বাতাস নীচের বাতাস অপেক্ষা শীতল। তাপরশ্মিগুলি পৃথিবীতেই বিশেষ বাধা পায় বলিয়া পৃথিবী গরম হইয়া উঠে।

অতএব তাপের বিকিরণ হইতে ঠাণ্ডা বস্তুর মধ্যে যে তাপ সঞ্চারণ হয় তাহা তাপের পরিবহণ অথবা পরিচলন প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। বিকিরণ জনিত তাপের সঞ্চারণ গরম বস্তুর সংযোগ ব্যতিরেকে হইয়া থাকে, কিন্তু তাপের পরিবহণ অথবা পরিচলন গরম বস্তুর সহিত ঠাণ্ডা বস্তুর সংযোগ না হইলে হয় না।

পরিবহণ, পরিচলন ও বিকিরণ—ইহাদের তুলনা

পরিবহণ	পরিচলন	বিকিরণ
গরম বস্তুর সহিত ঠাণ্ডা বস্তুর সংযোগে কঠিন বস্তুর মধ্যে তাপের পরিবহণ হইয়া থাকে। পরিবহণে পদার্থের অণুগুলি স্থান পরিবর্তন করে না। তাপের গতি পদার্থের গরম দিক হইতে ঠাণ্ডা দিকে হইয়া থাকে।	গরম বস্তুর সহিত ঠাণ্ডা বস্তুর সংযোগ হইলে তরল ও বায়বীয় পদার্থের মধ্যে তাপের পরিচলন হইয়া থাকে। ইহাতে পদার্থের অণুগুলি স্থান পরিবর্তন করে। তাপের গতি উর্দ্ধদিকে হইয়া থাকে।	ইহা বস্তুর সহিত সংযোগ ব্যতিরেকে হইয়া থাকে। মাধ্যমের ভিতর দিয়া যাইবার সময় ইহা মাধ্যমকে গরম করে না। যেখানে বাধা প্রাপ্ত হয় সেই বস্তুকে গরম করে। ইহা সকল দিকে সেকেণ্ডে ১৮৬ হাজার মাইল গতিতে সরল রেখায় গমন করে।

উত্তম ও অধম তাপ পরিবাহী পদার্থ (good and bad conductors of heat)—যে সকল বস্তুর মধ্যে তাপের পরিবহণ (conduction) হয় তাহাদের তাপ পরিবাহী (conductor of heat) বলে। কঠিন পদার্থের মধ্যেই তাপের পরিবহণ হইয়া থাকে। কিন্তু সকল কঠিন পদার্থের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা সমান নহে। যে সকল পদার্থের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা বেশী তাহাদের উত্তম তাপ পরিবাহী (good conductor of heat) বলে। ধাতু পদার্থসকল উত্তম তাপ পরিবাহী, যেমন, লোহা, তামা, রূপা, সোনা প্রভৃতি।

যে সকল পদার্থের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা কম তাহাদের অধম তাপ পরিবাহী (bad conductor of heat) বলে। কাপড়, কাগজ, কাচ, কাঠ, পশম, পালক, ফেলট্, কর্ক, এ্যাস্বেস্টস (asbestos), অভ্র, বাতাস প্রভৃতি অধম তাপ পরিবাহী।

যে সকল পদার্থের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা বেশী তাহাদের তাপ সংরক্ষণ ক্ষমতা কম। সেইজন্য লোহা যত শীঘ্র গরম হয় তত শীঘ্র ঠাণ্ডা হয়। উত্তম তাপ পরিবাহী বস্তু হইতে অতি সত্বর তাপ বিকীর্ণ (radiated) হইয়া যায়। গ্রীষ্মকালে বরফের দোকানগুলিতে বড় বড় বরফের চাঙ্গড় কাঠের গুঁড়া দিয়া ঢাকা থাকে। কাঠের গুঁড়ার তাপ পরিবহণ ক্ষমতা কম। সেইজন্য বাহিরের গরম বাতাস হইতে তাপ বরফের ভিতর খুব কম প্রবেশ করিতে পারে। তাহার জন্য বরফ বেশী গলিতে পারে না।

পশমের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা কম। পশমের ফাঁকে ফাঁকে বাতাস থাকে বলিয়া ইহার তাপ পরিবহণ ক্ষমতা আরও কমিয়া যায়। শীত নিবারণের জন্য লোকে পশমের জামা ব্যবহার করে। ইহা অধম তাপ পরিবাহী বলিয়া শরীরের তাপ জামার ভিতর দিয়া বেশী বাহির হইতে পারে না। সেইজন্য শরীর গরম থাকে।

আবার তাপ-গ্রহণ (heat absorption) বা তাপ-বিকিরণ radiation) করিবার ক্ষমতা বস্তুর রংয়ের উপর এবং বস্তুর মসৃণতা ও উজ্জ্বলতার উপর নির্ভর করে। কাল এবং খস্‌খসে (rough) বস্তুর তাপ বিকীর্ণ করিবার ক্ষমতা এবং বিকিরিত তাপ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সাদা এবং চক্‌চকে বস্তু অপেক্ষা অনেক বেশী। সেইজন্য শীতকালে কাল পোশাক এবং গ্রীষ্মকালে সাদা পোশাক ব্যবহার করিতে হয়। অধম তাপ পরিবাহী বস্তুর তাপ সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশী। সেইজন্য তাহাদের গরম হইতে যেমন বেশী সময় লাগে ঠাণ্ডা হইতেও তেমনি দেরী হয়। তাহারা ভিতর হইতে তাপ বাহির হইতে দেয় না, আবার বাহিরের তাপকেও ঠেকাইয়া রাখে।

পঞ্চম অধ্যায়

আলোক

(Light)

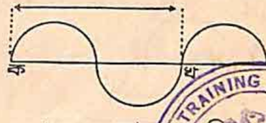
আলোক শক্তিরই এক রূপ। বৈদ্যুতিক বাতিতে তাড়িতশক্তি তাপে ও আলোকে রূপান্তরিত হয়। লণ্ঠনে কেরোসিন পোড়াইলে কেরোসিনের রাসায়নিক শক্তি তাপে ও আলোকে পরিণত হয়। চুলাতে কয়লা পোড়াইলে তাপ ও আলোক বাহির হয়। ঘর্ষণের চলশক্তি হইতেও তাপ ও আলোকের উদ্ভব হয়। যেমন চকমকি ঘষিলে তাপ ও আলোকের স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ পায়।

ইহাতে বুঝা যাইবে যে তাপ ও আলোকের সঙ্গে একটা নিকট সম্পর্ক আছে। অবশ্য সকল জায়গায় তাপ উৎপন্ন হইলে আলোক প্রকাশ পায় না। যেখানে আলোকের উদ্ভব সেখানে সাধারণতঃ তাপও প্রকাশিত হয়। জোনাকি পোকার আলোক ইহার ব্যতিক্রম। এই স্থলে আলোক উৎপন্ন হয় কিন্তু বেশী তাপ হয় না। জোনাকি ধরিলে হাত মোটেই গরম হয় না, কিন্তু জোনাকির আলোক জ্বলিতে থাকে। সেই জন্য জোনাকিকে শীতল বাতি বলিতে পারা যায়। জোনাকির মধ্যে একটা বিশেষ পদার্থ আছে। ইহা বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হইলে উহার রাসায়নিক শক্তি আলোকরূপে প্রকাশ পায়।

আলোক-বিকীর্ণ-শক্তি (Radiant energy)—সূর্য হইতে সতত প্রচণ্ড তাপ ও আলোক-শক্তি বিকীর্ণ হইতেছে। এই বিকীর্ণ-শক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে উহা যাহার মাধ্যমে বিকীর্ণ হয় তাহা তপ্ত বা আলোকিত হয় না। কোন বস্তুর দ্বারা প্রতিহত হইলে সেই বস্তু

তপ্ত বা আলোকিত হয়। সূর্য হইতে পৃথিবী প্রায় ১০ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবী হইতে বায়ুমণ্ডল সম্ভবতঃ ৭০০—৮০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। অতএব সূর্যের আলোক-শক্তিকে কোটি কোটি মাইল বায়ুহীন মহাশূন্যের ভিতর দিয়া আসিতে হইতেছে। তাহাতে সেই মহাশূন্য তপ্ত বা আলোকিত হইতেছে না। পৃথিবী দ্বারা প্রতিহত হইয়া তাপ ও আলোক-শক্তি পৃথিবীকে তপ্ত ও আলোকিত করিতেছে।

তাপ ও আলোক দুইই একই ধরণের শক্তি। দুইয়ের রশ্মিই সরল রেখায় ভ্রমণ করে। তাহাদের গতিবেগ সমান—সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল। তাহারা তরঙ্গের আকারে আসিয়া পৃথিবীকে আঘাত করিয়া উহাকে তপ্ত ও আলোকিত করে। জলে যেমন কোন তরঙ্গ অন্য তরঙ্গ অপেক্ষা বড় হইতে পারে, তেমনি তাপরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (wavelength) আলোকরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বড় (চিত্র ২৪)। সেই জন্য তাপ ও আলোক ভিন্নরূপে প্রকাশ পায় কিন্তু তাহাদের প্রকৃতিগত প্রভেদ নাই।

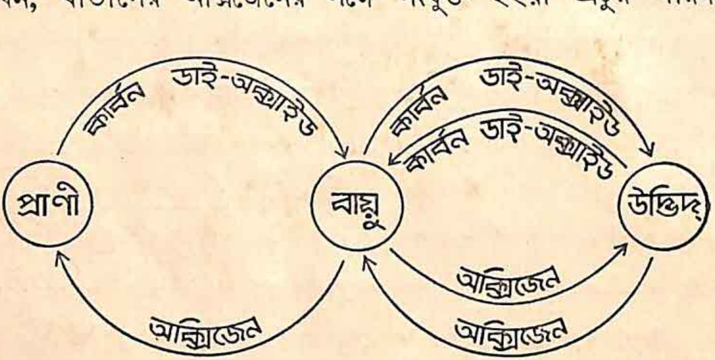


২৪। আলোকরশ্মির তরঙ্গ (কখ)

সবুজ পাতার উপরে আলোকের প্রভাব; সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis)—আমরা যে গাছের পাতায় সবুজ রং দেখি তাহার কারণ পাতার মধ্যে একটি সবুজ পদার্থ আছে। তাহার নাম ক্লোরোফিল (chlorophyll)। ইহার সাহায্যে পাতা দিবালোকে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বিশ্লিষ্ট করিয়া উহার কার্বনকে নিজের শরীরের শর্করাজাতীয় উপাদানে সংশ্লিষ্ট করে। ইহা দ্বারা উদ্ভিদ্ বাঁচে ও বাড়ে। এই প্রক্রিয়াতে পাতা অক্সিজেনকে বাতাসে

ত্যাগ করে এবং ইহা রাত্রিতে সম্ভব নয়, কারণ ইহার জন্য সূর্যালোক দরকার। এই প্রক্রিয়াকে **সালোকসংশ্লেষ** বলে।

এই সালোকসংশ্লেষ জীবজগতের জন্য একান্ত আবশ্যক। জীবজন্তু নিয়ত নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে বাতাস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত করিতেছে। কাঠ কয়লা, কেরোসিন, পেট্রোল প্রভৃতি যে সমস্ত দাহ্য বস্তু পোড়ান হয়, তাহাদের উপাদান কার্বন, বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া প্রচুর পরিমাণে



২৫। বায়ু ও জীবজগতের মধ্যে কার্বন ও অক্সিজেনের আবর্তন

কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি করে। মৃত জীবজন্তু হইতেও জীবাণুর প্রভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে নির্গত হইতেছে। ক্রমাগত এই রকম চলিতে থাকিলে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইত ও অক্সিজেনের পরিমাণ কমিত। তাহা হইলে জীবের প্রাণধারণ অসম্ভব হইত। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবীর অসংখ্য গাছপালা এই অবস্থা ঘটিতে দেয় না। তাহারা কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতে কার্বন গ্রহণ করিয়া বাতাসে অক্সিজেন ছাড়িয়া দিতেছে। এইজন্য বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের সমতা রক্ষা হইতেছে (চিত্র ২৫)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জড় ও জীবের প্রভেদ

(Distinction between living and non-living)

আমরা পৃথিবীতে দুই রকমের পদার্থ দেখিতে পাই, যথা,—**জড় ও জীব**। যাহাদের প্রাণ বা জীবন আছে তাহারাই জীব। যাহাদের প্রাণ নাই তাহারা জড় পদার্থ। প্রাণ বা জীবন কি তাহার সঠিক ধারণা বা ব্যাখ্যা করা যায় না। সমস্ত জীবের এমন কতকগুলি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য আছে যাহা দিয়া উহাদের জড় পদার্থ হইতে সহজেই আলাদা করা যায়। গাছপালা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রভৃতিতে এই লক্ষণগুলি দেখা যায়; সুতরাং উহারা জীব। জল, বায়ু, মাটি প্রভৃতিতে এই লক্ষণগুলি দেখা যায় না বলিয়াই উহারা জড় পদার্থ। যে সকল লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য দেখিয়া জীবকে জড় হইতে আলাদা করা হয় তাহা এখানে বলা হইল।

১। **জীবের দেহকোষ** (Cell)—উদ্ভিদ্ ও প্রাণিমাত্রেরই দেহ এক বা একাধিক ছোট ছোট **কোষ (সেল)** দিয়া গঠিত। অণুবীক্ষণ ছাড়া কোষগুলিকে দেখা যায় না। এই কোষগুলিই সমস্ত জীবের শরীর গঠনের উপাদান। উদ্ভিদ্-কোষের চারিধারে একটি শক্ত আবরণ থাকে; প্রাণিদেহের কোষে এইরূপ কোনও আবরণ নাই। প্রত্যেক কোষের মধ্যে **প্রোটোপ্লাজ্‌ম** (protoplasm) নামে অল্পবিস্তর স্বচ্ছ, জেলির মত ঘন একটি পদার্থ থাকে। এই প্রোটোপ্লাজ্‌মই হইল জীবিত বস্তু, প্রাণের আধার।

২। **পুষ্টি** (Nutrition)—জীবমাত্রেরই দেহ-পুষ্টির জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। সবুজ উদ্ভিদ্ বায়ু ও মাটি হইতে খাদ্যের উপাদান যোগাড় করিয়া দিনের বেলায় সূর্যকিরণ ও দেহ-কোষে যে সবুজ রং (ক্লোরোফিল) বা পত্রহরিৎ আছে তাহার সাহায্যে নানাপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে। উদ্ভিদ্ যে খাদ্য প্রস্তুত করে প্রাণীরা সেই খাদ্য খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। দেহের পুষ্টিসাধন ছাড়া কোন জীবই বাঁচিতে পারে না। জড়জগতের পুষ্টি বলিয়া কিছু নাই।

৩। **শ্বাসকার্য** (Respiration)—শ্বাসকার্যের সময় বাহিরের বাতাস জীবের দেহে প্রবেশ করে। দেহে যে খাদ্য জমা থাকে বাতাসের অক্সিজেন তাহার কিছু দহন করে। ফলে দেহের মধ্যে তাপ ও শক্তির সঞ্চার হয় ও দূষিত গ্যাস কার্বন ডাই-অক্সাইড জীবদেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। জীবদেহের মধ্যে সকল সময়ে এই রকম দহন হইয়া থাকে। জলের মধ্যে যে অক্সিজেন দ্রব অবস্থায় থাকে তাহা জলজ উদ্ভিদ্ বা জলজ প্রাণীর শ্বাসকার্যে সাহায্য করে। জড় পদার্থের শ্বাসকার্য বলিয়া কিছু নাই।

৪। **দেহের বৃদ্ধি** (Growth)—জীব বাহির হইতে খাদ্য গ্রহণ করে ও শরীরের মধ্যে উহার নানাপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাইয়া উহাদের নিজের দেহের উপযোগী পদার্থে পরিণত করে। ফলে তাহার দেহের বৃদ্ধি হয়। জড় পদার্থের এইরকম পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয় না।

৫। **গমনাগমন শক্তি** (Locomotion and movement)—প্রায় সকল প্রাণীতেই এই লক্ষণটি বিশেষ ভাবে দেখা যায়। তাহারা এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাতায়াত ও নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করিতে পারে। উদ্ভিদ্ সাধারণতঃ মূল দিয়া মাটিতে আটকাইয়া থাকে বলিয়া তাহাদের চলাফেরা করিবার শক্তি

থাকে না। কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর ছোট ছোট জলজ উদ্ভিদ্ এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাতায়াত করিতে পারে। চলাফেরা করিতে না পারিলেও উদ্ভিদ্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করিতে পারে। জড়পদার্থে এই লক্ষণটি দেখা যায় না।

৬। **দেহ হইতে দূষিত পদার্থ ত্যাগ** (Excretion)—জীবমাত্রেই দেহের দূষিত পদার্থ ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু জড়ের সে ক্ষমতা নাই। প্রাণী ঐ সকল জিনিস সময়মত ত্যাগ করে। উদ্ভিদ্ সাধারণতঃ ঐ সমস্ত দূষিত পদার্থ দেহের কোনও স্থানে সাময়িকভাবে জমা কারয়া রাখে এবং সময়ে সময়ে দেহ হইতে উহা বাহির করিয়া দেয়।

৭। **উদ্দীপনায় প্রতিক্রিয়া** (Irritability)—জীব বাহির হইতে আঘাত, তাপ, ঠাণ্ডা, জল, বায়ু, বিদ্যুৎ, আলোক, স্পর্শ প্রভৃতির দ্বারা উত্তেজিত হইলে তাহার দেহে প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যায়। একটি উদ্ভিদ্‌শিশুকে যেমন করিয়াই রাখা হউক না কেন, তাহার প্রধানমূল মাটির দিকে ও কাণ্ড উপরদিকে যাইবে। লজ্জাবতী গাছের পাতা স্পর্শ করিলেই উহার পাতা সংকুচিত হইয়া নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে। আঘাত পাইলে প্রাণিমাত্রেরই দেহ সংকুচিত হয় এবং অজ্ঞাতসারে দেহকে সরাইয়া লয়। জড়দেহে কিন্তু এরূপ কোনও প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ সাধারণতঃ দেখা যায় না।

৮। **জন্ম ও বংশবৃদ্ধি** (Birth and Reproduction)—জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে জন্ম ও বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন। জীব-জগতের প্রত্যেক জাতিই তাহার বংশবৃদ্ধির চেষ্টা করে। যদি নূতন জীবের জন্ম না হইয়া কেবল মৃত্যুই হইত তাহা হইলে এই পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব থাকিত না। জড়ের এই ক্ষমতা নাই।

৯। **মৃত্যু** (Death)—জীবমাত্রেরই মৃত্যু আছে। জীবের মৃত্যু হইলে তাহার দেহ জড়পদার্থে পরিণত হয়। জড়পদার্থের মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই।

সপ্তম অধ্যায়

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর পার্থক্য

(Differences between Plants and Animals)

উদ্ভিদের দেহ-কোষ সাধারণতঃ একটি শক্ত আবরণ বা কোষ-প্রাচীর (cell-wall) দিয়া ঘেরা থাকে। ইহাতে সেলিউলোজ (cellulose) নামে একরকম কার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থ আছে। প্রাণীর দেহ-কোষে উদ্ভিদের মত শক্ত কোষ-প্রাচীর থাকে না এবং সেলিউলোজও পাওয়া যায় না।

সবুজ উদ্ভিদের দেহ-কোষে সবুজকণিকার (chloroplasts) মধ্যে ক্লোরোফিল (chlorophyll) নামে এক রকম সবুজ রং থাকে। প্রাণীর দেহ-কোষে সাধারণতঃ সবুজকণিকা এবং ক্লোরোফিল থাকে না।

সবুজ উদ্ভিদ্ বায়ু, মাটি অথবা জল হইতে দ্রব অবস্থায় খাদ্যের নানারকম উপাদান যোগাড় করিয়া উহা হইতে দিনের বেলায় সূর্যকিরণ ও সবুজকণিকার সাহায্যে শর্করাজাতীয় খাদ্য তৈয়ারী করে। প্রাণীরা নিজেদের খাদ্য তৈয়ারী করিতে পারে না। উহারা উদ্ভিদ্ হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাদ্য যোগাড় করে।

প্রোটোপ্লাজ্‌মের উপাদানগুলির মধ্যে একটি হইল নাইট্রোজেন। জীব বায়ু হইতে এই নাইট্রোজেন লইতে পারে না। উদ্ভিদ্ সাধারণতঃ

নাইট্রোজেন মাটি হইতে যোগাড় করে। পরে এই নাইট্রোজেন, চিনি ও অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিশিলে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের সৃষ্টি হয়। তখন উহা হইতে প্রোটোপ্লাজ্‌মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রাণী উদ্ভিদের দ্বারা তৈয়ারী প্রোটিন হইতে অথবা অন্য কোনও প্রাণীর দেহ হইতে নাইট্রোজেন যোগাড় করে।

জীবদেহের আর একটি প্রধান উপাদান হইল অঙ্গার বা কার্বন। উদ্ভিদ্ খাদ্য-প্রস্তুত করিবার সময় বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতে কার্বন যোগাড় করে এবং উহা হইতে নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈয়ারী করে। এই খাদ্যের দ্বারাই প্রোটোপ্লাজ্‌মের পুষ্টি হয়। প্রাণীরা উদ্ভিদের দ্বারা তৈয়ারী খাদ্য হইতে কার্বন যোগাড় করে।

উদ্ভিদ্ জৈব পদার্থ হিসাবে নানারকম খাদ্য দেহের মধ্যে জমা রাখে। শ্বাসকার্যের সময় এই খাদ্যের দহনের ফলে উদ্ভিদের দেহের মধ্যে তাপ ও শক্তির উৎপত্তি হয়। এই বিষয়ে উদ্ভিদ্ প্রাণিজগতের উপর নির্ভর করে না। তাপ ও শক্তির জন্য প্রাণীকে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রাণী উদ্ভিদ্ হইতে যে চিনি জাতীয় খাদ্য যোগাড় করে তাহার কিছু অংশের দহন শ্বাসকার্যের সময় হইয়া থাকে এবং প্রাণিদেহের মধ্যে তাপ ও শক্তির সৃষ্টি হয়।

উদ্ভিদের দেহ-কোষে প্রাচীর আছে বলিয়া উহারা কেবল জলীয় অবস্থায় খাদ্য লইতে পারে। প্রাণী কঠিন ও জলীয় দুই প্রকার খাদ্যই গ্রহণ করিয়া থাকে।

অধিকাংশ উদ্ভিদ্ই এক জায়গায় আবদ্ধ থাকে। ইহাদের চলাফেরা করিবার শক্তি নাই। কতকগুলি ছোট ছোট জলজ উদ্ভিদ্ এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাতায়াত করিতে পারে। প্রায় সকল প্রাণীই এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় চলাফেরা করে। স্পঞ্জ,

প্রবাল প্রভৃতি প্রাণী কিন্তু জলের নীচে কোন কিছুর উপর আটকাইয়া থাকে।

উদ্ভিদ্ জীবনের শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাদের দেহের সকল অংশ একসঙ্গে বৃদ্ধি পায় না। প্রাণীর বৃদ্ধিকাল নির্দিষ্ট। দেহে যে সমস্ত অপ্রয়োজনীয় দূষিত পদার্থের সৃষ্টি হয় উদ্ভিদ্ সাধারণতঃ তাহা দেহের কোনও স্থানে জমা করিয়া রাখে এবং সময়ে সময়ে দেহ হইতে উহা ত্যাগ করে। প্রাণী ঐ সকল দূষিত পদার্থ দেহ হইতে নিয়মিতভাবে ত্যাগ করিয়া থাকে। উচ্চশ্রেণীর প্রাণী ঐ সকল পদার্থ ঘাম, মল ও মূত্ররূপে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়।

উদ্ভিদের দেহে সাধারণতঃ কোনও সামঞ্জস্য থাকে না। অধিকাংশ প্রাণীর দেহে সামঞ্জস্য আছে।

অষ্টম অধ্যায়

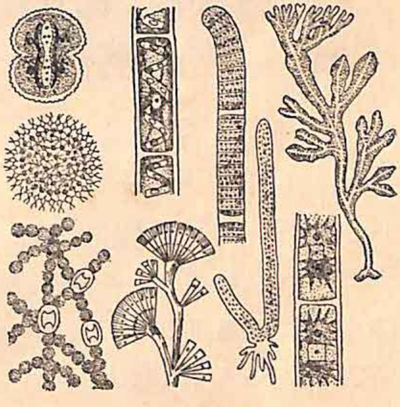
উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ

(Classification of Plants and Animals)

উদ্ভিদ্-জগৎ (Plant Kingdom)—বিশাল উদ্ভিদ্-জগতের যাহারা অধিবাসী তাহাদের কথা মনে রাখিতে হইলে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ করা প্রয়োজন। লক্ষণগুলি আপাতদৃষ্টিতে সকল সময়ে খুব যুক্তিযুক্ত মনে না হইলেও বিশেষজ্ঞগণ নিজেদের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া ঐ সকল লক্ষণের উপর বেশী নির্ভর করিয়াছেন। যাহাদের দেহে মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল, বীজ প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায় তাহাদিগকেই সাধারণতঃ উদ্ভিদ্ বলা হয়।

এমন অনেক উদ্ভিদ্ আছে যাহাদের দেহে কিন্তু ঐরূপ কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই। এই সকল উদ্ভিদ্‌কে নিম্ন-শ্রেণীর উদ্ভিদ্ বলা হয়। প্রথম প্রকারের উদ্ভিদ্‌কে সর্বাপেক্ষা উচ্চ-শ্রেণীর উদ্ভিদ্ বলে। এই দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ্ ছাড়া আরও নানা আকারের উদ্ভিদ্ দেখা যায়। ইহাদের বিষয়ে জানিতে হইলে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ জানা প্রয়োজন। সমস্ত উদ্ভিদ্-রাজ্যকে উহাদের অঙ্গবিন্যাস ও গঠনের জটিলতা হিসাবে প্রধানতঃ চার ভাগ করা হইয়াছে, যথা :—

১। **সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ্** (Thallophyta)—ইহারা সর্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ্। ইহাদের দেহে **মূল, কাণ্ড, পাতা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ** থাকে না। ইহাদের দেহ একটি বা বহু কোষ দিয়া গঠিত। ইহাদিগকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা :—



২৬। শেওলা

(ক) **শেওলা** (Algæ) —এই সকল উদ্ভিদের দেহের **কোষের মধ্যে সবুজকণিকা থাকে** বলিয়া ইহাদিগকে সাধারণতঃ সবুজ দেখায়। পুকুর হইতে সমুদ্র পর্যন্ত সকল রকম জলাশয়ে, ভিজা মাটির উপরে, পাহাড়, প্রাচীর ও বৃক্ষকাণ্ডের গায়ে নানাপ্রকার শেওলা বা শৈবাল দেখা যায় (চিত্র ২৬)।

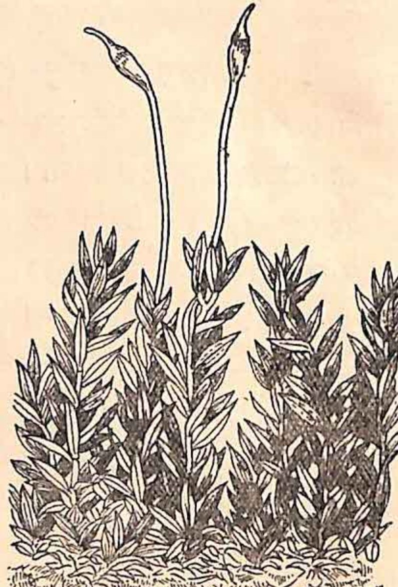
(খ) **ছত্রাক** (Fungi)—ইহাদের দেহে **সবুজকণিকা নাই**। সেইজন্য ইহাদের রং সাধারণতঃ সবুজ হয় না, যেমন, ব্যাঙের ছাতা।

বর্ষাকালে ভিজা জায়গায়, ক্ষেতে, বনে, পচা কাঠ, পাতা, গোবর প্রভৃতির উপর নানাপ্রকার ছত্রাক বা ছাতা জন্মিয়া থাকে (চিত্র ২৭)।



২৭। ছত্রাক

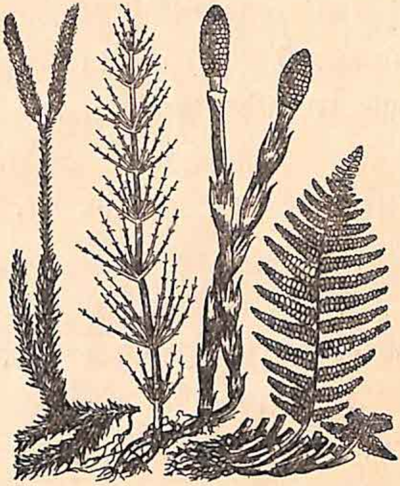
২। **মস্ জাতীয় উদ্ভিদ্** (Bryophyta)—সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ্ অপেক্ষা ইহাদের দেহ কিছু জটিল। ইহাদের কাহারও কাহারও **দেহে কাণ্ড ও পাতা দেখা যায় কিন্তু মূল একেবারেই থাকে না,** যেমন মস্ (চিত্র ২৮)। বর্ষাকালে দেওয়াল বা ছাদের উপর যে সবুজ আস্তরণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই রকমের উদ্ভিদ্।



২৮। মস্

৩। **ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ্** (Pteridophyta)—ইহাদের দেহে মূল, কাণ্ড, পাতা প্রভৃতি **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ** আছে, যেমন ফার্ণ, লাইকোপোডিয়াম, শুশ্নি শাক প্রভৃতি (চিত্র ২৯)।

এই তিন প্রকার উদ্ভিদ্ বীজ ধারণ করে না বলিয়া ইহাদিগকে **অবীজ উদ্ভিদ্** বলা হয়।



২৯। ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ্

৪। **সবীজ উদ্ভিদ্** (Spermatophyta)—ইহাদের দেহের গঠন সর্বাপেক্ষা জটিল। ফার্ণজাতীয় উদ্ভিদের মত ইহাদের দেহে **মূল, কাণ্ড, পাতা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে কিন্তু ইহারা বীজ ধারণ করে।** এই সকল উদ্ভিদ্ দুই রকমের হইয়া থাকে, যথা,—**ব্যক্তবীজী** ও **গুপ্তবীজী।**



৩০। সাইকাড

ব্যক্তবীজী (Gymnosperm) উদ্ভিদের **বীজ ফলের মধ্যে ঢাকা থাকে না।** ইহারা ফলহীন উদ্ভিদ্, যেমন, পাইন, সাইকাড (চিত্র ৩০) প্রভৃতি। **গুপ্তবীজী** (Angiosperm) উদ্ভিদের **বীজ ফলের মধ্যে ঢাকা থাকে,** বাহির হইতে দেখা যায় না। এই সকল উদ্ভিদ্‌কে আবার বীজপত্রের সংখ্যা হিসাবে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা :—

(ক) **একবীজপত্রী** (Monocotyledon)—এই সকল উদ্ভিদের বীজে **একটি** করিয়া **বীজপত্র** (cotyledon) থাকে, যেমন, ধান, নারিকেল, অর্কিড প্রভৃতি।

(খ) **দ্বিবীজপত্রী** (Dicotyledon)—ইহাদের বীজে **দুইটি** করিয়া বীজপত্র থাকে, যেমন, আম, জাম, বট, অশ্বত্থ, মটর, তেঁতুল, দেবদারু প্রভৃতি।

প্রাণিজগৎ (Animal Kingdom)—প্রাণিজগৎকেও দেহের গঠনের জটিলতা অনুসারে কয়েকটি **পর্বে** ভাগ করা হইয়া থাকে, যথা :—

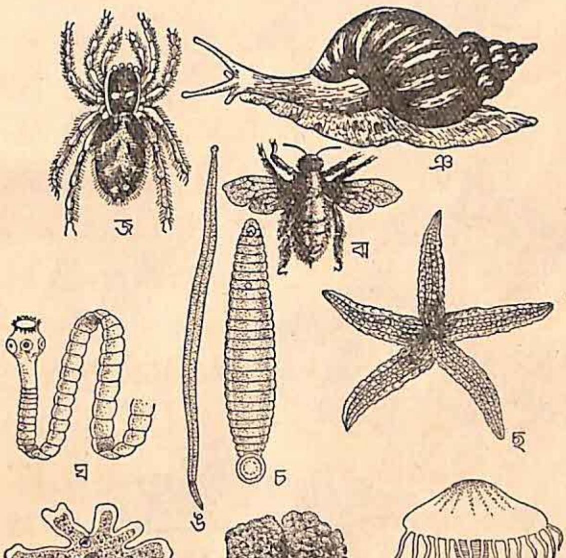
১। **আদ্যপ্রাণী** (Protozoa)—ইহারা এক-কোষ প্রাণী, যেমন **অ্যামিবা** (চিত্র ৩১, ক)। আদ্যপ্রাণী নানাপ্রকার। ইহারা সাধারণতঃ জলে থাকে। মানবদেহেও ইহাদের পাওয়া যায়। ইহাদের মুখ, চোখ, নাক, কান কিছুই নাই। একটি প্রাণীর দেহ আপনা হইতে দুই ভাগে ভাগ হইয়া দুইটি প্রাণী হইয়া যায়।

২। **ছিদ্রাল প্রাণী** (Porifera)—ইহাদের দেহ দুই স্তর কোষ দিয়া গঠিত, যেমন **স্পঞ্জ** (চিত্র ৩১, খ)। ইহারা সকলেই জলচর।

৩। **একনালী দেহী** (Cœlenterata)—ইহাদের খাদ্যবহা নালী ছাড়া দেহে আর কোন নালী নাই। অনেকেরই টেনট্যাক্‌ল (tentacle) আছে। ইহাদের মধ্যে কেবল **হাইড্রা** পুকুরের জলজ লতার উপর আটকাইয়া থাকে, বাকী সামুদ্রিক, যেমন **জেলি-ফিস** (চিত্র ৩১, গ), **প্রবাল** ইত্যাদি।

৪। **চেপ্টাকৃমি** (Platyhelminthes)—ইহারা বেশীর ভাগই উভলিঙ্গ, যেমন **লিভার ফ্লুক** বা **যকৃৎ কৃমি** (চিত্র ৩১, ঘ)। উহাদিগকে প্রধানতঃ ভেড়ার ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুর যকৃত ও পিত্তস্থলী হইতে পাওয়া যায়।

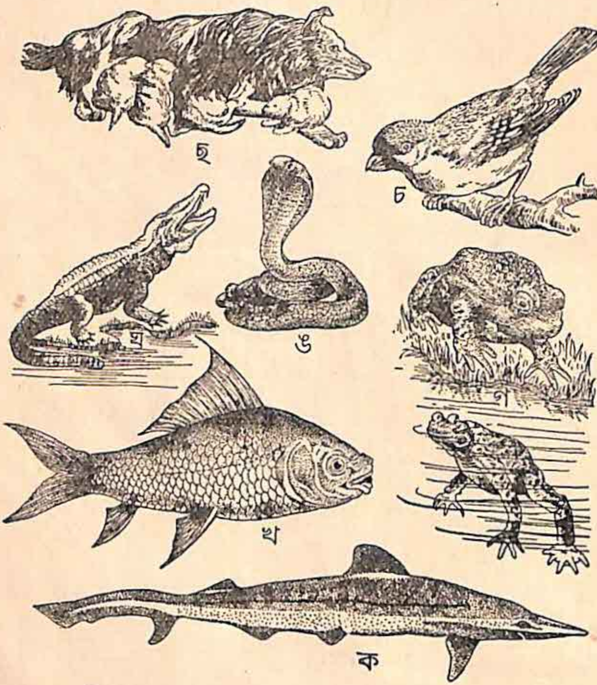
৫। **গোলকৃমি** (Nemathelminthes)—ইহারা সূতা বা দড়ির মত লম্বা প্রাণী। ইহাদের দেহ একপ্রকার পুরু ও স্বচ্ছ আবরণে ঢাকা থাকে। ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। মানুষের পেটের সাধারণ **কৃমি** ইহাদের উদাহরণ (চিত্র ৩১, ঙ)।



৩১। নানাবিধ অমেরুদণ্ডী প্রাণী : অ্যামিবা (ক), স্পঞ্জ (খ), জেলি ফিস (গ), চেপ্টাকৃমি (ঘ), গোলকৃমি (ঙ), জোঁক (চ), তারামাছ (ছ), মাকড়সা (জ), মৌমাছি (ঝ) ও শামুক (ঞ)

৬। **অঙ্গুরীমাল** (Annelida)—ইহাদের দেহ পরস্পর জোড়া এক সারি অঙ্গুরীয়ের মত অংশে গঠিত। দেহটি একটি স্বচ্ছ আবরণে

ঢাকা থাকে। ইহারা উভলিঙ্গ, যেমন কেঁচো, জোঁক ইত্যাদি (চিত্র ৩১, চ)।



৩২। নানাবিধ মেরুদণ্ডী প্রাণী : ক—খ, মৎস্য (হাঙ্গর ও কাতলা); গ, উভচর (ব্যাঙ); ঘ—ঙ, সরীসৃপ (কুমীর ও সাপ); চ, পক্ষী (চড়ুই); ছ, স্তন্যপায়ী (কুকুর)

৭। **কণ্টকত্বক্** (Echinodermata)—ইহাদের ত্বকে কাঁটা থাকে। ইহাদের সকলেই সমুদ্রে বাস করে ও ইহারা ধীরে ধীরে চলাফেরা করে, যেমন **তারামাছ, সমুদ্র শসা** ইত্যাদি (চিত্র ৩১, ছ)। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে।

৮। **সন্ধিপদ** (Arthropoda)—ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। কখন কখন ইহাদের শরীরের প্রত্যেক বা অনেক অঙ্গের আবার **উপাঙ্গ** থাকে। উপাঙ্গ নানা অংশে বিভক্ত। ইহাদের দেহ একটি কঠিন আবরণে ঢাকা থাকে। প্রাণিজগতের এই পর্বটি সর্বাপেক্ষা বড়। **চিংড়ি, কাঁকড়া, বিছা, মাকড়সা** ও **পতঙ্গ** ইহার মধ্যে পড়ে (চিত্র ৩১, জ-ঝ)।

৯। **শম্বুক** (Mollusca)—ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে, আবার উভলিঙ্গও আছে। সন্ধিপদ ও ইহাদের মধ্যে শ্বাসকার্য, খাদ্য-পরিপাক, রক্ত চলাচল প্রভৃতি দেহের কাজ নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের অপেক্ষা আরও ভালভাবে হইয়া থাকে। **শামুক, ঝিনুক, শঙ্খ,** সমুদ্রের **শীর্ষপদ** প্রভৃতি প্রাণী ইহাদের উদাহরণ (চিত্র ৩১, ঞ)।

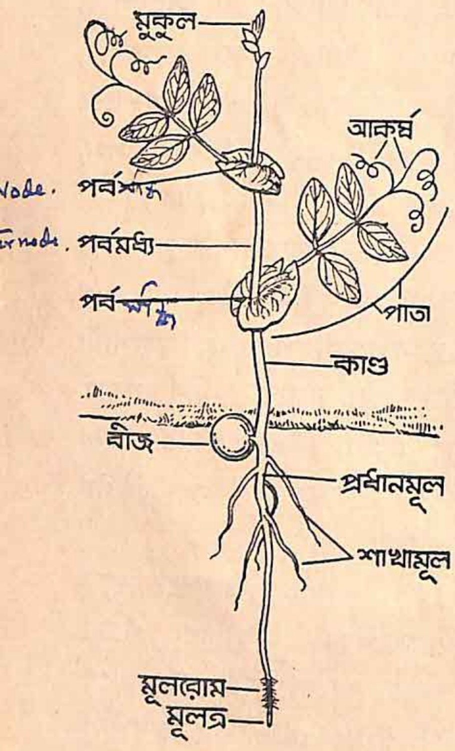
১০। **মেরুদণ্ডী** (Vertebrata)—যাহাদের শিরদাঁড়া আছে তাহারা এই পর্বে পড়ে। ইহাদের আবার পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, যথা,—**মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী** ও **স্তন্যপায়ী** (৩২নং চিত্র)। মাছ, ব্যাঙ, টিকটিকি, সাপ, কচ্ছপ, কুমীর প্রভৃতি প্রথম তিন শ্রেণীভুক্ত প্রাণীর রক্ত ঠাণ্ডা। পাখী ও স্তন্যপায়ীর রক্ত গরম। এইজন্য প্রথম প্রকার প্রাণীকে 'অনুষ্ণ-শোণিত' এবং দ্বিতীয় প্রকার প্রাণীকে 'উষ্ণ-শোণিত' প্রাণী বলে।

প্রাণিজগতের দুইটি মুখ্য বিভাগ—আদ্যপ্রাণী হইতে শম্বুক অবধি প্রথম নয় পর্বের প্রাণীদের মেরুদণ্ড নাই, আর দশম পর্বের প্রাণীদের মেরুদণ্ড আছে। এক কথায়, প্রাণিজগতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, **অমেরুদণ্ডী** (Invertebrata) ও **মেরুদণ্ডী**।

মটর গাছের দেহাংশ পর্যবেক্ষণ ঃ মূল, কাণ্ড, পাতা ও ফুল এবং তাহাদের কাজ

(Observations on different parts of pea plant : root, stem, leaves and flowers with their functions)

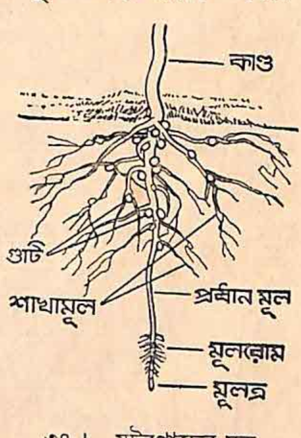
মটর গাছের দেহাংশ—মটরের একটি ছোট চারাগাছ (চিত্র ৩৩) মাটি হইতে উপড়াইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে উহার এক অংশ মাটির উপরে ও অপর অংশ মাটির নীচে থাকে। মাটির নীচের অংশকে **মূল** বা **শিকড়** বলে। মাটির উপরে যে অংশ থাকে তাহা **কাণ্ড** এবং কতকগুলি সবুজ রংয়ের **পাতা** লইয়া গঠিত। মূল, কাণ্ড এবং পাতা, এই তিনটি হইল মটর গাছের প্রধান অংশ। চারাগাছ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণ-পরিণত মটর গাছের দেহে এই তিনটি অঙ্গ ছাড়া আর কোনও অঙ্গই দেখা যায় না। ইহাদের সাহায্যে মটর গাছের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরিণত বয়সে শীতকালে মটর গাছে **ফুল** ফোটে, পরে ঐ ফুল হইতে **ফল** হয় এবং উহার মধ্যে



৩৩। মটরের চারাগাছ

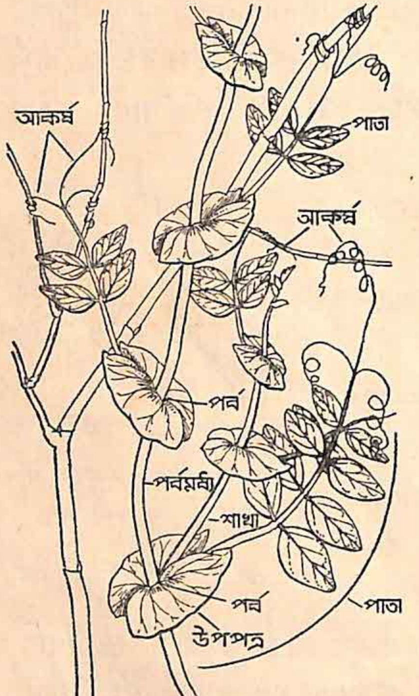
বীজ থাকে। ফল পাকিলে বীজ মাটিতে পড়ে ও অনুকূল অবস্থায় অঙ্কুর বাহির হয়। ক্রমে উহা হইতে মটরের নূতন চারাগাছ জন্মে। ফুল, ফল এবং বীজকেও গাছের অঙ্গ বলা হয়। বংশের বৃদ্ধি ও বিস্তারের প্রয়োজন হইলে ইহারা দেখা দেয়।

মূল—মটর গাছের মূলে একটি প্রধান অংশ দেখা যায়; ইহাকে **প্রধান মূল** (tap root) বলে (চিত্র ৩৩-৩৪)। উহা কাণ্ডের গোড়া হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়া মাটির মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত যায়। ইহার আগা অতিশয় নরম। মাটির ভিতর দিয়া বাড়িবার সময় যাহাতে এই অংশটির কোনরূপ ক্ষতি না হয় সেজন্য ইহার আগায় একটি টুপির মত ঢাকনা আছে। ইহাকে **মূলত্র** (root-cap) বলে। আগার কিছু পিছনে মূলের কতক অংশ জুড়িয়া অসংখ্য ছোট ছোট সূক্ষ্ম রোমের মত দেখা যায়। এইগুলিকে **মূলরোম** (root-hair) বলে। এই সকল মূলরোমের সাহায্যেই মটর গাছ মাটি হইতে জলে দ্রব অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য শুষিয়া লয়। প্রধান মূলের আগার দিকে যেখান হইতে মূলরোমগুলি বাহির হইয়াছে তাহার কিছু পিছন হইতে অনেক **শাখা-প্রশাখা** চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। উহাদেরও প্রধান মূলের মত মূলত্র ও মূলরোম থাকে। বীজের ভিতরকার উদ্ভিদ্-শিশু বা ভ্রূণের (embryo) ভাবিমূলটি ক্রমশঃ বাড়িয়া মটর গাছের প্রধান মূল ও উহার শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি করে। ভাবিমূল হইতে জন্মায় বলিয়া মটর গাছের মূলকে **প্রকৃত মূলও** (true root) বলে।



৩৪। মটরগাছের মূল

মূলের কাজ—মূল প্রধানতঃ তিন রকমের কাজ করিয়া থাকে। উহা মটর গাছকে মাটির উপর শক্ত করিয়া আটকাইয়া রাখে এবং সেইজন্য ঝড়-বাতাসে উহা উপড়াইয়া যায় না। মূল মাটি হইতে ধাতব লবণ জলে দ্রব অবস্থায় মূলরোমের সাহায্যে শুষিয়া লয় এবং খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য ঐ রস কাণ্ডের ভিতর দিয়া পাতায় পাঠাইয়া দেয়। খাদ্য অতিরিক্ত হইলে মটরগাছ প্রয়োজন মত উহার মূলে কিছু খাদ্য জমা করিয়া রাখে।



৩৫। মটর গাছের কাণ্ড, পাতা ও আকর্ষ

কাণ্ড—মটর গাছের কাণ্ড নরম এবং ফাঁপা, দেখিতে অনেকটা নলের মত (চিত্র ৩৫)। ইহার রং সবুজ। কাণ্ডে কোন কাষ্ঠময় অংশ নাই বলিয়া উহা দুর্বল। সেইজন্য কাণ্ডটি সোজা হইয়া মাটির উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। উহা অন্য কোনও অবলম্বনকে জড়াইয়া উপরে উঠে। এই কারণে মটর গাছকে **লতা** (creeper) বলে। মটর গাছের কাণ্ডটি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উহার দেহের নির্দিষ্ট অংশ হইতে পাতাগুলি পর্যায়ক্রমে বিপরীত দিকে বাহির হইয়াছে; উহারা এলোমেলো ভাবে সাজান নাই। এই নির্দিষ্ট

স্থানগুলিকে **পর্ব** (node) এবং দুইটি পর্বের মাঝখানের অংশকে **পর্বমধ্য** (internode) বলে (চিত্র ৩৫)। প্রত্যেক পাতার কোলে একটি করিয়া **মুকুল** (bud) আছে। কোন কোনও জায়গায় পাতার কোলের মুকুল বাড়িয়া শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি করিয়াছে। গাছের বিস্তৃতি প্রধান কাণ্ডের বা শাখার আগার মুকুল দিয়াই হইয়া থাকে।

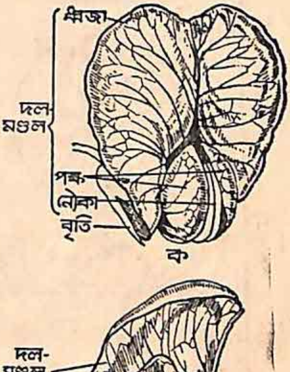
কাণ্ডের কাজ—কাণ্ড ও উহার শাখা-প্রশাখা সবুজ পাতাকে সূর্যকিরণে ধরিয়া রাখে এবং সময় মত ফুল ও ফল ধারণ করে। উহাদের ভিতর দিয়া মাটির রস মূল হইতে পাতায় যায় এবং সেখানে খাদ্য প্রস্তুত হইবার পর ঐ খাদ্য কাণ্ডের ভিতর দিয়া দেহের নানা অংশে চলাচল করে। খাদ্য অতিরিক্ত হইলে উহা কাণ্ডের ভিতরের বিভিন্ন অংশে ভবিষ্যতের জন্য জমা থাকে।

পাতা—মটর গাছের পাতার রং সবুজ। আম, জবা প্রভৃতির পাতার বোঁটার আগায় একটি করিয়া **ফলক** (blade) থাকে (**একফলক** বা **মৌলিক পত্র**—simple leaf), কিন্তু মটর পাতায় সেরূপ থাকে না। ইহার পাতায় বোঁটার আগায় কয়েকটি ছোট ছোট ফলক বা **অনুফলক** (leaflet) পাখীর পালকের মত একটি দণ্ডের দুই পাশে সাজান থাকে। এইজন্য মটর পাতাকে **বহুফলক** বা **যৌগিক পত্র** (compound leaf) এবং **পক্ষাকার** (pinnate) পাতা বলে (চিত্র ৩৫)। মৌলিক পাতার কোলে মুকুল থাকে কিন্তু যৌগিক পাতার কোলে মুকুল থাকিলেও ঐ ছোট ছোট অনুফলকগুলির কোলে কোনও মুকুল থাকে না। মটর পাতার আগার দিকে কয়েকটি আকর্ষ (tendril) থাকে (চিত্র ৩৫)। কয়েকটি অনুফলক রূপান্তরিত হইয়া ইহাদের সৃষ্টি করে। ইহা ছাড়া প্রত্যেকটি পাতার বোটার দুইপাশে ফলকের মত একজোড়া **উপপত্র** (stipules) বাহির হয়।

পাতার কাজ—পাতার একটি প্রধান কাজ হইল খাদ্য প্রস্তুত করা। মূল মাটি হইতে জলে দ্রব অবস্থায় খাদ্যের উপকরণ যোগাড় করে। উহা ক্রমে কাণ্ডের ভিতর দিয়া পাতায় পৌঁছায়। পাতার ত্বকে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র (stomata) থাকে। বাতাস হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড এই সকল ছিদ্র দিয়া পাতার মধ্যে প্রবেশ করে। এই সকল উপকরণ হইতে পাতা উহার সবুজ রং (ক্লোরোফিল) ও সূর্যকিরণের সাহায্যে চিনি, শ্বেতসার প্রভৃতি খাদ্য তৈয়ারী করে। দিনের বেলা ছাড়া পাতা খাদ্য তৈয়ারী করিতে পারে না, কারণ দিনেই সূর্যকিরণ পাওয়া যায়। এই ক্রিয়াকে **সালোকসংশ্লেষ** (photosynthesis) বলে। ইহা ছাড়া মটর গাছ প্রধানতঃ পাতার সাহায্যেই **শ্বাসকার্য** চালাইয়া থাকে। পাতার ছিদ্র দিয়া বায়ুর সহিত অক্সিজেন পাতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মটর গাছের দেহে সর্বত্র চলাচল করে। এই অক্সিজেনের সহিত সঞ্চিত খাদ্যের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে দহনকার্য চলে এবং শরীরের মধ্যে তাপ ও শক্তির উৎপত্তি হয়। এই দহনকার্য চলিবার সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড ও সামান্য পরিমাণ জলীয় বাষ্পের উৎপত্তি হয় এবং উহারা পাতার ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। সালোকসংশ্লেষ শুধু দিনের আলোকেই হইয়া থাকে কিন্তু শ্বাসকার্য দিনরাত সকল সময়ে চলিয়া থাকে। পাতার প্রধান কাজগুলির মধ্যে দেহের ভিতরকার অতিরিক্ত জলকে বাষ্পাকারে বাহির করিয়া দেওয়াও একটি কাজ। ইহাকে **প্রস্বেদন** (transpiration) বলে। ইহা ছাড়া মটরগাছ পাতার আকর্ষের দ্বারা উহার দুর্বল কাণ্ডকে অন্য অবলম্বনকে জড়াইয়া উঠিতে সাহায্য করে।

ফুল—মটরফুল সম্পূর্ণ, উভলিঙ্গ ও সবৃন্তক (চিত্র ৩৬)। **সম্পূর্ণফুল** (complete flower) বলিতে যাহাদের **বৃতি, দলমণ্ডল, পুংকেশর**

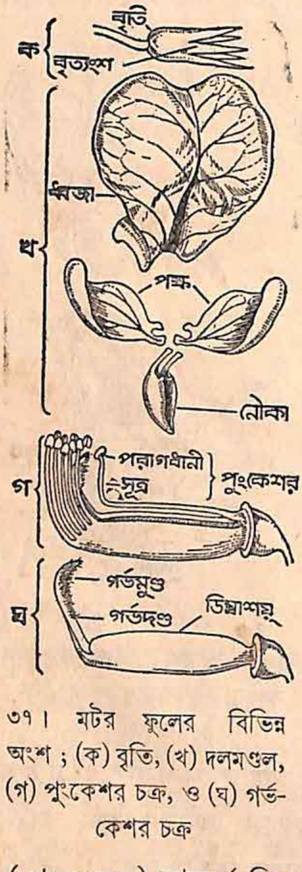
চক্র ও **গর্ভকেশর চক্র,** এই চারিটি স্তবক থাকে তাহাদের বুঝায়। ইহাদের কোন একটি স্তবকের অভাব হইলে তাহাকে **অসম্পূর্ণ ফুল** (incomplete flower) বলে। **উভলিঙ্গ** (hemaphrodite) ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর দুইই থাকে। মটর ফুলের একটি ছোট বোঁটা আছে। কাণ্ডের আগার দিকে পাতার কোলে একটি করিয়া ফুল ফোটে। কোন কোন পাতার কোলে একটি দণ্ডের গায়ে ২।৩টি ফুল সাজান থাকে ; ইহাকে **পুষ্পমঞ্জরী** (inflorescence) বলে।



৩৬। রমটরে ফুল (ক) (খ) ফুলকে দুইভাগে ভাগ করিয়া ভিতরকার অংশগুলিকে দেখান হইয়াছে

একটি মটর ফুল লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে উহার সকলের নীচে ও বাহিরের দিকে একটি সবুজ-রংয়ের আবরণ আছে। এই আবরণটির নাম **বৃতি** (calyx)। উহার উপরিভাগ দাঁতের মত সামান্য কাটা এবং ঐ একটি দাঁতের মত অংশকে **বৃত্যংশ** (sepal) বলে (চিত্র ৩৭, ক)। বৃত্যংশ সংখ্যায় পাঁচটি এবং উহারা নীচের দিকে পরস্পর জুড়িয়া গিয়া আবরণটির সৃষ্টি করিয়াছে। কুঁড়ি অবস্থায় উহা ফুলের ভিতরকার অন্যান্য অংশগুলিকে ঢাকিয়া রাখে এবং রৌদ্র, বাতাস, শিশির প্রভৃতি হইতে উহাদের রক্ষা করে। বৃতির ঠিক ভিতরে ও সামান্য উপরে ফুলের দ্বিতীয় স্তবক। ইহার নাম **দলমণ্ডল** (corolla)। ইহাতে পাঁচটি পাপড়ি বা **দল** (petal) আছে (চিত্র ৩৭, খ)। উহারা পরস্পর পৃথক। মটরফুলের

পাপড়িগুলি সাধারণতঃ সাদা রংয়ের হইয়া থাকে এবং উহারা দেখিতে অনেকটা প্রজাপতির মত। একটি পাপড়ি অপরগুলি হইতে আকারে অনেক বড় এবং কুঁড়ি অবস্থার অপর চারিটি পাপড়িকে ঢাকিয়া রাখে ; ইহার নাম **ধ্বজা** (standard)। ধ্বজার মধ্যে দুই পাশে দুইটি পাপড়ি আছে ; ইহাদিগকে **পক্ষ** (wing petals) বলা হয়। পক্ষের ভিতরে ও পাশে আরও দুইটি পাপড়ি আছে। ইহারা পরস্পর জুড়িয়া গিয়া **নৌকার** মত একটি খোলের (keel) সৃষ্টি করিয়াছে। পাপড়ি বা দল ফুলের সৌন্দর্য বাড়ায় এবং অনেক সময়ে ইহাদের গন্ধও সুমিষ্ট হয়। ইহাদের রূপে, রংয়ে ও গন্ধে মুগ্ধ হইয়া নানাপ্রকার কীট-পতঙ্গ ফুলে আসিয়া বসে এবং পরোক্ষভাবে বংশরক্ষায় সাহায্য করে। দলমণ্ডলের ভিতরে পর পর তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবক থাকে। ইহাদের নাম যথা-ক্রমে **পুংকেশর চক্র** (andrœcium) ও **গর্ভকেশর চক্র** (gynæcium)। পুংকেশর চক্রে দশটি **পুংকেশর** (stamen) আছে (চিত্র ৩৭, গ)। প্রত্যেক পুংকেশরের লম্বা ও সরু অংশটির নাম **সূত্র** (filament) ; উহার মাথায় একটি ছোট ও চেপ্টা **পরাগধানী** (anther) আছে। এই পরাগধানীর মধ্যে



৩৭। মটর ফুলের বিভিন্ন অংশ ; (ক) বৃতি, (খ) দলমণ্ডল, (গ) পুংকেশর চক্র, ও (ঘ) গর্ভ-কেশর চক্র

অসংখ্য ছোট ছোট **পরাগ** বা **রেণু** (pollen-grains) থাকে। দশটি পুংকেশরের মধ্যে নয়টির সূত্র একত্র জুড়িয়া গিয়া গর্ভকেশর চক্রের কতক অংশ ঢাকিয়া রাখিয়াছে এবং অপর পুংকেশরটি আলাদা। ফুলের ঠিক মাঝখানে উহার **গর্ভকেশর চক্র** (চিত্র ৩৭, ঘ)। উহা একটি মাত্র গর্ভকেশর দিয়া গঠিত। উহার গোড়ার দিক দেখিতে লম্বা, ফাঁপা ও চেপ্টা। এই অংশটির নাম **ডিম্বাশয়** (ovary)। ডিম্বাশয়ের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দানা বা **ডিম্বক** (ovule) একাধারে সারিবদ্ধ ভাবে সাজান আছে। ইহারাই ভাবী বীজ। ডিম্বাশয়ের উপরের অংশ ক্রমশঃ সরু হইয়া একটি **গর্ভদণ্ডের** (style) সৃষ্টি করিয়াছে। গর্ভদণ্ডটির আগা কিছু চেপ্টা। ইহার নাম **গর্ভমুণ্ড** (stigma)। গর্ভমুণ্ডের সংখ্যা হইতে অনেক সময়ে গর্ভকেশরের সংখ্যা ঠিক করা হয়।

মটর ফুলের চারিটি স্তবক ফুলের বোঁটার আগায় একটির উপর অপরটি, এভাবে সাজান থাকে। বোঁটার এই অংশটিকে **পুষ্পাধার** (thalamus) বলে।

ফুলের কাজ—ফুলের প্রধান কাজ হইল বংশ-রক্ষা ও বংশ-বৃদ্ধি করা। ফুল না ফুটিলে ফল হইবে না এবং ফল না হইলে বীজ পাওয়া যাইবে না। ইহাতে বংশ-রক্ষা ও বংশ-বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে। নানা-প্রকার কীট-পতঙ্গকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিবার জন্যই ফুল নানা রংয়ের ও সুগন্ধ যুক্ত হয়। রং ও গন্ধের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া মধুর লোভে কীট-পতঙ্গ ফুলে বসিলে পরাগ গর্ভমুণ্ডের সহিত লাগিয়া যায় ও পরাগ-সংযোগ ঘটে। কালে নানারূপ জটিল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ডিম্বাশয় ও ডিম্বক বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ফল ও বীজে পরিণত হয়। পরাগ-মিলনের কাজ শেষ হইলে বৃত্যংশ, পাপড়ি ও পুংকেশরগুলি শুকাইয়া যায় এবং ফুল হইতে ফলটি ক্রমশঃ বাহির হইয়া পড়ে।

অনুশীলনী

মটরগাছ ঃ—স্থলজ, বর্ষজীবী ও লতাজাতীয় উদ্ভিদ্।

মূল ঃ—প্রধান মূল ও তাহার শাখা-প্রশাখা; প্রত্যেক মুলের আগায় মূলত্র ও মূলরোম থাকে।

কাণ্ড ঃ—সবুজ, নরম, ফাঁপা ও দুর্বল; পর্ব ও পর্বমধ্যে বিভক্ত; আগায় শীর্ষমুকুল থাকে।

পাতা ঃ—সবুজ, যৌগিক ও পক্ষাকার; গোড়ায় দুইটি উপপত্র আছে; আগার অনুফলকগুলি আকর্ষে পরিবর্তিত হয়; পাতার পাশে মুকুল থাকে।

ফুল ঃ—সম্পূর্ণ, উভলিঙ্গ ও সবৃন্তক।

বৃতি ঃ—বৃত্যংশ ৫টি, পরস্পর যুক্ত, সবুজ রংয়ের।

দলমণ্ডল ঃ—পাপড়ি ৫টি, পরস্পর আলাদা, অসমান; দেখিতে অনেকটা প্রজাপতির মত (ধ্বজা ১টি, পক্ষ ২টি ও নৌকায় ২টি পালড়ি থাকে)।

পুংকেশর চক্র ঃ—পুংকেশর ১০টি, ৯টি পরস্পর জোড়া ও ১টি আলাদা; প্রত্যেক পুংকেশরে সূত্র ও পরাগধানী আছে।

গর্ভকেশর চক্র ঃ—গর্ভকেশর ১টি; উহা ডিম্বাশয়, গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ডে বিভক্ত; ডিম্বাশয়ের একধারে ডিম্বকগুলি সারিবদ্ধভাবে সাজান থাকে।

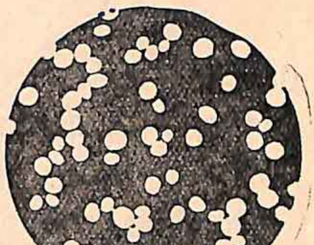
দশম অধ্যায়

কয়েকটি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ্ ও প্রাণী

(Some simple Plants and Animals)

ঈস্ট্ (Yeast)

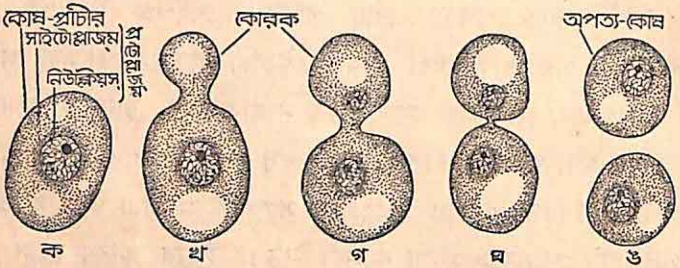
ঈস্ট্ একপ্রকার ছত্রাক জাতীয় সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ্। ইহাদের দেহ একটি মাত্র কোষ দিয়া গঠিত। সেইজন্য ইহাদের শুধু অণুবীক্ষণের সাহায্যেই দেখা যায়। ইহারা বাতাসে ভাসিয়া আসে এবং খেজুর রস, আঙ্গুরের রস প্রভৃতি নানারকমের চিনিযুক্ত মাধ্যমে সহজেই জন্মিয়া থাকে। বিশুদ্ধ খেজুর রস সকাল বেলায় একটি খোলা পাত্রে রাখিয়া দিলে বাতাস ও রৌদ্রের সংস্পর্শে আসিয়া উহা 'মাতিয়া' বা 'গাঁজিয়া' ফেনাযুক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে। ইহার কারণ হইল যে কয়েকটি কোষ বাতাস হইতে খেজুর রসের উপর পড়ে এবং উপযুক্ত মাধ্যম পাইয়া উহারা অল্প সময়ের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ কোষের সৃষ্টি করিয়া বংশ-বৃদ্ধি করিতে থাকে। এই সময়ে কোষগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চিনির রসকে ক্রমশঃ কোহল (alcohol) ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিবর্তিত করে এবং তাপের সৃষ্টি হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড বুদ্বুদের আকারে বাহির হইয়া বাতাসে মিশিয়া যায়।



৩৮। ঈস্টের কোষগুলি অণুবীক্ষণের সাহায্যে যেরূপ দেখা যায়

চিত্রকরেরা যে কাল কালি দিয়া ছবি আঁকেন উহার এক ফোঁটার সহিত এক ফোঁটা মাতানো খেজুর রস মিশাইয়া লইয়া অণুবীক্ষণের

সাহায্যে পরীক্ষা করিলে অতি সহজেই ঈস্টের ছোট ছোট কোষগুলি ভাল করিয়া দেখা যায় (চিত্র ৩৮)। কোষগুলি দেখিতে গোলাকার অথবা ডিমের আকারের মত। প্রত্যেক কোষে **প্রোটোপ্লাজ্‌ম** থাকে। উহার বাহিরের দিকে একটি শক্ত **কোষ-প্রাচীর** আছে। এই প্রোটোপ্লাজ্‌মই ঈস্টের জীবনের সকল কাজ করিয়া থাকে। প্রোটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে **নিউক্লিয়স** নামে উহার একটি ঘন অংশ আছে



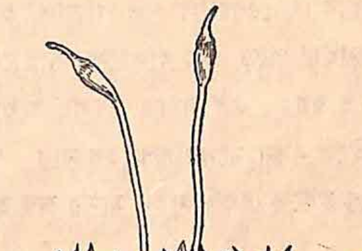
৩৯। ঈস্টের একটি কোষ (ক) ও উহার কোরকোদ্‌গম (খ-ঙ)

(চিত্র ৩৯, ক)। নিউক্লিয়সকে বাদ দিলে প্রোটোপ্লাজ্‌মের যে অংশ বাকী থাকে তাহার নাম **সাইটোপ্লাজ্‌ম** (cytoplasm)। সাইটোপ্লাজ্‌মে প্রধানতঃ প্রোটিন ও তৈল জাতীয় খাদ্য ইতস্ততঃ জমা থাকে।

ঈস্টের কোষ যে উপায়ে তাড়াতাড়ি বংশ-বৃদ্ধি করিয়া থাকে তাহাকে **কোরকোদ্‌গম** (budding) বলে (চিত্র ৩৯, খ-ঙ)। এই সময়ে কোষ-প্রাচীরের এক জায়গা ক্রমশঃ ফুলিয়া উঠিয়া একটি কোরকের (bud) সৃষ্টি করে। এই কোরকটি ক্রমশঃ বড় হইয়া মাতৃকোষ (mother-cell) হইতে আলাদা হইয়া যায়। ইহাকে অপত্য-কোষ (daughter-cell) বলে। খেজুর রসে কোহলের পরিমাণ বেশী হইলে ঈস্টের কোরকোদ্‌গম বন্ধ হইয়া যায়। তখন উহারা বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করে।

মস্ (Moss)

মস্ একরকমের নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ্ (চিত্র ৪০)। ইহাদের বীজ হয় না। মসের দেহে কাণ্ড ও পাতা থাকে কিন্তু মূল একেবারেই থাকে না। বর্ষাকালে ভিজা মাটি, গাছের ছাল, দেওয়াল বা ছাদের উপর ইহারা একরকম সবুজ ও নরম আস্তরণের সৃষ্টি করে। বৎসরের অন্য সময়ে ইহাদের দেখা যায় না। ইহারা সংখ্যাতীত এবং সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থায় থাকে। ইহাদের কাণ্ড সোজা, সরল ও সূতার মত। কোন কোন মসের কাণ্ড শাখাযুক্ত হইয়া থাকে। এই রকমের কাণ্ড সাধারণতঃ লতাইয়া যায়। কাণ্ডের গায়ে ও চারিধারে অসংখ্য ছোট ছোট সবুজ রংয়ের পাতা একটির উপর আর একটি এভাবে সাজান থাকে। মসের কাণ্ডের নীচে মূল থাকে না। তাহার বদলে কাণ্ডের গোড়া হইতে ছোট ছোট রোমের মত বাহির হয়। ইহাদের **রাইজয়েড** (rhizoid) বলে। ইহাদের সাহায্যে মস্ মাটি, গাছের ছাল প্রভৃতির সঙ্গে নিজেদের ভাল করিয়া আটকাইয়া রাখে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থান হইতে খাদ্যদ্রব্য শুষিয়া লয়।



৪০। মস্

বর্ষার শেষে জলের অভাবে ইহারা মরিয়া যায় বলিয়া মস্ বংশরক্ষা করিবার উপায় করে। ঐ সময়ে কাণ্ড বা শাখার আগা হইতে ধীরে ধীরে একটি সূতার মত অংশ সোজা উপরের দিকে বাড়িতে থাকে। ইহার আগা দেখিতে মোটা এবং উহা একটি টুপীর মত ঢাক্‌নি দিয়া ঢাকা থাকে। এই মোটা অংশটির ভিতর অসংখ্য রেণু (spore) জন্মায়। রেণুগুলি পূর্ণ-পরিণত হইলে মোটা অংশটি হইতে উহারা ছড়াইয়া পড়ে এবং বাতাসের সাহায্যে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় নীত হয়। এই সময়ে জলের অভাব হইবে বলিয়া সাধারণতঃ রেণু হইতে নূতন মসের জন্ম হয় না। পুনরায় বর্ষাকাল আসিলে প্রত্যেক রেণু হইতে একটি নূতন মসের জন্ম হয়।

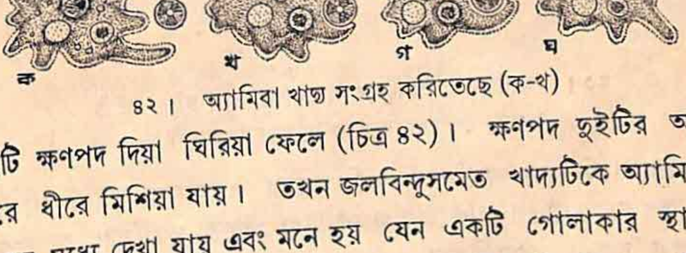
অ্যামিবা (Amœba)

অ্যামিবা একপ্রকার আদ্যপ্রাণী। ইহারা সাধারণতঃ পুকুর, নদী, নালা প্রভৃতির তলায় জলজ উদ্ভিদের গায়ে অথবা কাদার মধ্যে বাস করে। অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে অ্যামিবাকে অত্যন্ত ছোট বাদামী রংয়ের বিন্দুর মত দেখায়। এই বিন্দুগুলি জেলির মত পদার্থ এবং সর্বদা নড়াচড়া করে বলিয়া ইহাদের কোন নির্দিষ্ট আকার থাকে না। অ্যামিবার দেহ একটিমাত্র কোষ দিয়া গঠিত। কোষে নিউক্লিয়সযুক্ত প্রোটোপ্লাজ্‌ম আছে এবং উহারই বাহিরের অংশ একটি পাতলা আবরণীর সৃষ্টি করে (চিত্র ৪১)। উদ্ভিদ্-কোষের মত ইহাদের প্রোটোপ্লাজ্‌মের বাহিরে কোনও শক্ত কোষ-প্রাচীর থাকে না। সেই



৪১। অ্যামিবা

কারণে অ্যামিবার দেহ সহজেই নড়াচড়া করিতে পারে। এই সময়ে উহার দেহ হইতে প্রোটোপ্লাজ্‌মের অংশবিশেষ ধীরে ধীরে লম্বা হইয়া যে কোন দিকে আগাইয়া যায় এবং উহার বিপরীত দিকের প্রোটোপ্লাজ্‌মকে সামনের দিকে টানিয়া লয়। প্রোটোপ্লাজ্‌মের এই প্রসারিত অংশটিকে **ক্ষণপদ** (pseudopodium) বলে (চিত্র ৪১)। অনেকগুলি ছোট ছোট ক্ষণপদ একসঙ্গে বাহির হইতে পারে, কিন্তু উহাদের মধ্যে যে কোন একটি লম্বা হইয়া যায় এবং অপরগুলি বাড়িতে না পারিয়া ক্রমশঃ ছোট হইয়া প্রোটোপ্লাজ্‌মের সহিত মিশিয়া যায়। ক্ষণপদগুলির সাহায্যেই অ্যামিবা এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় চলাফেরা করে। ইহারা ছোট ছোট শেওলা অথবা এক-কোষ প্রাণীকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। খাদ্য সংগ্রহ করিবার সময় অ্যামিবা খাদ্যের দিকে আগাইয়া যায় এবং খাদ্য ও একবিন্দু জলকে

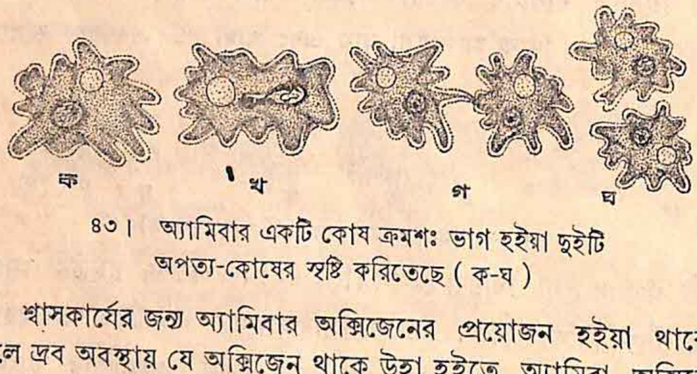


৪২। অ্যামিবা খাদ্য সংগ্রহ করিতেছে (ক-ঘ)

দুইটি ক্ষণপদ দিয়া ঘিরিয়া ফেলে (চিত্র ৪২)। ক্ষণপদ দুইটির আগা ধীরে ধীরে মিশিয়া যায়। তখন জলবিন্দুসমেত খাদ্যটিকে অ্যামিবার দেহের মধ্যে দেখা যায় এবং মনে হয় যেন একটি গোলাকার স্থানের মধ্যে খাদ্যটি রহিয়াছে। ইহাকে **খাদ্য-ভ্যাকুওল** (food vacuole) বলে (চিত্র ৪১-৪২)। খাদ্য-ভ্যাকুওল ক্ষণস্থায়ী পাকস্থলীর কাজ করে। অ্যামিবা ইহার মধ্যে জারকরসের সাহায্যে খাদ্যকে হজম করে। খাদ্য হজম হইবার পর খাদ্য-ভ্যাকুওলটি ক্রমশঃ ছোট হইতে থাকে এবং পরে অদৃশ্য হয়।

অ্যামিবার দেহ-কোষের মধ্যে আর একরকমের একটি স্বচ্ছ ও গোলাকার অংশ দেখা যায়। ইহার নাম **সংকোচী-ভ্যাকুওল** (contractile vacuole)। ইহাতে জলের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড বুদ্বুদের আকারে থাকে। ইহা ধীরে ধীরে আকারে বাড়িয়া ক্রমে প্রোটোপ্লাজ্‌মের বাহিরের দিকে ভাসিয়া উঠে এবং হঠাৎ ফাটিয়া যায় এবং ঐ স্থানে তখনই আর একটি নূতন সংকোচী-ভ্যাকুওল দেখা দেয়। এই কারণে মনে হয় যেন সংকোচী-ভ্যাকুওলটি পর্যায়ক্রমে সংকুচিত ও প্রসারিত হইতেছে। অ্যামিবা সংকোচী-ভ্যাকুওলের মধ্যে দেহের দূষিত পদার্থ জমা করে ও উহা মাঝে মাঝে বাহির করিয়া দেয়।

অ্যামিবা অতি তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করিতে পারে। একটি কোষের মাঝখান ক্রমশঃ সরু হইয়া দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায় এবং দুইটি অপত্য-কোষের সৃষ্টি করে (চিত্র ৪৩)।



৪৩। অ্যামিবার একটি কোষ ক্রমশঃ ভাগ হইয়া দুইটি অপত্য-কোষের সৃষ্টি করিতেছে (ক-ঘ)

শ্বাসকার্যের জন্য অ্যামিবার অক্সিজেনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। জলে দ্রব অবস্থায় যে অক্সিজেন থাকে উহা হইতে অ্যামিবা অক্সিজেন জোগাড় করে। অ্যামিবার দেহকোষের মধ্যে অক্সিজেন জলে দ্রব অবস্থায় প্রবেশ করে ও কোষের ভিতরকার দাহ্য পদার্থের দহন হইয়া থাকে। ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উৎপত্তি হয় ও শক্তি সঞ্চার হইয়া থাকে। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড সংকোচী-ভ্যাকুওলের মধ্যে জমা হয় ও পরে দেহ-কোষ হইতে বাহির হইয়া যায়।

একাদশ অধ্যায়

মানবদেহ
(Human body)

দেহের সূক্ষ্ম উপাদান—অন্যান্য জীবের ন্যায় মানবদেহেও অসংখ্য **কোষ** বা **সেল** আছে (চিত্র ৪৪, ক)। ইহারাই শরীর গঠনের আদি, সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও মূল উপাদান। প্রত্যেক কোষ প্রোটোপ্লাজ্‌ম দিয়া গঠিত। প্রোটোপ্লাজ্‌ম উহার বাহিরের দিকে একটি সূক্ষ্ম আবরণীর সৃষ্টি করে। উহাকে **কোষ** বা **সেল-ঝিল্লী** (cell-membrane) বলে। প্রোটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে একটি **নিউক্লিয়স** থাকে। নিউক্লিয়সকে বাদ দিলে প্রোটোপ্লাজ্‌মের যে অংশ বাকী থাকে তাহার নাম **সাইটোপ্লাজ্‌ম**। মানবদেহের কোষগুলিই জীবনের সকল কাজ করিয়া থাকে। পূর্ণ-পরিণত হইলে প্রত্যেক কোষ দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায় এবং এইরূপে অসংখ্য কোষের সৃষ্টি হয়।



৪৪। কোষ (ক) ও কলা (খ)

একই আকারের কয়েকটি কোষ পরস্পর জুড়িয়া গিয়া **কলা** (tissue) গঠন করে (চিত্র ৪৪, খ)। কোষগুলি সমধর্মী অর্থাৎ উহারা একসঙ্গে একই কাজ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া উহারা একই রকমে উৎপন্ন হয়। দেহের বিভিন্ন অংশে নানারকমের কলা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে, যেমন :—(১) আচ্ছাদক বা ঝিল্লী-কলা (epithelial tissue),—

শরীরের অনাবৃত সকল স্থানই এই কলা দিয়া গঠিত, যেমন চর্মের বাহিরের অংশ, অন্ননালী, পাকস্থলী, অন্ত্র, শিরা, ধমনী প্রভৃতির ভিতরকার অনাবৃত অংশ ; (২) **সংযোজক কলা** (connective tissue),—ইহা শরীরের সকল জায়গায় থাকিয়া যন্ত্র সমূহের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে অথবা এক যন্ত্রের সহিত অন্য যন্ত্রকে যোগ করিয়া রাখে, যেমন রক্ত, মেদ, তরুণাস্থি, অস্থি প্রভৃতি ; (৩) **পেশী কলা** (muscular tissue),—এই কলা দিয়া সকল পেশীই গঠিত এবং ইহা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে নড়াচড়া করিতে সাহায্য করে ; (৪) **বার্তাবহ বা নার্ভ কলা** (nervous tissue),—এই কলা দিয়া মস্তিষ্ক, নার্ভ প্রভৃতি গঠিত এবং ইহার সাহায্যে মস্তিষ্ক হইতে দেহের অন্য জায়গায় অথবা দেহের যে কোন জায়গা হইতে খবর মস্তিষ্কে যায়।

দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রসকল কয়েকটি কলা দিয়া গঠিত। কতকগুলি যন্ত্র পরস্পর মিলিয়া একসঙ্গে দেহের ভিন্ন ভিন্ন কাজ করিয়া থাকে। কর্মের বিভাগ অনুসারে এইরূপে কয়েকটি যন্ত্র লইয়া ভিন্ন ভিন্ন **তন্ত্রের** (system) সৃষ্টি করা হইয়াছে, যেমন, **পাচন-তন্ত্র** (digestive system), **শ্বসন-তন্ত্র** (respiratory system), **রেচন-তন্ত্র** (excretory system), **রক্ত-সংবহন-তন্ত্র** (circulatory system), **পেশী-তন্ত্র** (muscular system), **স্নায়ু-তন্ত্র** (nervous system) প্রভৃতি।

দেহের স্থূল উপাদান—আমাদের দেহ প্রধানতঃ **মস্তক বা মাথা, ধড় বা মধ্যশরীর** এবং **হাত-পা** প্রভৃতি অঙ্গ লইয়া গঠিত। দেহের ভিতরে আছে অস্থি বা হাড়ের **কঙ্কাল** ; এই কঙ্কালই দেহের কাঠামো (চিত্র ৪৯)। **মাংসপেশী** দিয়া এই কঙ্কাল ঢাকা থাকে। মাংসপেশীর উপর থাকে পাতলা **চর্বির** আস্তরণ এবং উহা **চর্ম** বা চামড়া দিয়া

ঢাকা থাকে। ইহাদের মধ্যে সরু মোটা অসংখ্য **শিরা** ও **ধমনী** চলিয়া গিয়াছে এবং উহাদের ভিতর দিয়া রক্ত চলাচল করিতেছে (চিত্র ৪৫)। ইহা ছাড়া অসংখ্য **লসিকানালী** ও **নার্ভ** শাখা-প্রশাখা লইয়া দেহের মধ্যে ছড়াইয়া আছে। আর আছে মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস, যকৃৎ, পাকস্থলী প্রভৃতি **দেহের ভিতরকার যন্ত্রসমূহ**।



৪৫। চর্ম, মেদ, পেশী, ধমনী, শিরা ও নার্ভ

মানবদেহের স্থূল উপাদানগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, যেমন, (১) চর্ম, মাংসপেশী, চর্বি, প্রভৃতি **কোমল অংশ**, (২) রক্ত, লসিকা প্রভৃতি **তরল অংশ**, (৩) হাড়, দাঁত, নখ প্রভৃতি **কঠিন অংশ**, এবং (৪) হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস, পাকস্থলী, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি ভিতরকার **যন্ত্রসমূহ**।

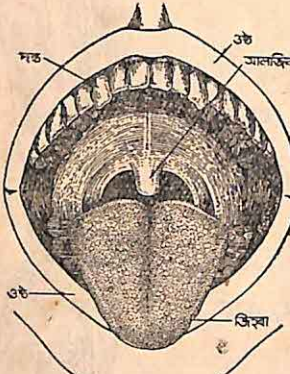
মাথা (**head**)—ইহার মধ্যে থাকে আমাদের **মস্তিষ্ক** (brain)। মাথার সামনে ও নীচের দিকে থাকে **মুখমণ্ডল** এবং উহাতে **চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা** ও **মুখবিবর** আছে।

মধ্যশরীর বা ধড় (trunk)—ইহার তিনটি অংশ আছে, যথা, গ্রীবা (neck), **বক্ষ** (chest) ও **উদর** (abdomen)।

মাথা ও মধ্যশরীরের ভিতর চারিটি গহ্বর বা বিবর আছে। যথা :—

(১) **নাসাপথ** (nasal passage)—এই পথের সামনে দুইটি এবং পিছনে দুইটি দ্বার আছে। সম্মুখের দ্বার দুইটিকে **নাসারন্ধ্র** (nostril) বলে (চিত্র ৪৭)।

(২) **মুখগহ্বর** (buccal cavity)—দুইটি ওষ্ঠ এই বিবরের বাহিরে অবস্থিত। ইহাদের পিছনে বিবরের মধ্যে দুই পাটী **দন্ত** ও একটি **জিহ্বা** থাকে (চিত্র ৪৬)। মুখবিবরের ভিতরে পিছন দিকে থাকে **গলবিল** বা **ফারিংক্স** (pharynx)। ইহার নীচে দুইটি নালী আসিয়া মিলিয়াছে। একটির নাম **শ্বাসনালী** (trachea) ও অপরটিকে বলে **গ্রাসনালী** (gullet or æsophagus)। শ্বাসনালী থাকে



৪৬। মুখগহ্বর



৪৭। নাসাপথ ও মুখগহ্বরের ভিতরকার বিভিন্ন অংশ

সামনে ও গ্রাসনালী থাকে তাহার পিছনে (চিত্র ৪৭)। **জিহ্বা** গলদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া সামনের দিকে প্রসারিত থাকে। জিহ্বার পিছনে ও শ্বাসনালীর উপরে একটি ঢাকনা থাকে। তাহার নাম **অধিজিহ্বা** (epiglottis)। মুখবিবরের ছাদের নাম **তালু** (hard palate)। এই তালু বেশ কঠিন। ইহার পিছনে আছে **নরমতালু** (soft palate)। তালুর পিছনে যে ছোট মাংসপিণ্ড ঝুলিতেছে তাহাকে **আলজিব** (uvula) বলে (চিত্র ৪৬)।

(৩) **বক্ষ গহ্বর** (thoracic cavity)—ইহা দেহকাণ্ডের উপরের দিকে থাকে এবং দেখিতে একটি পিঞ্জর বা খাঁচার মত। বক্ষ

গহ্বরের দুই পাশে দুইটি গোলাপী রংয়ের **ফুস্ফুস** (lungs) থাকে (চিত্র ৫৬)। ফুসফুস দুইটির মধ্যে বামদিকে হেলিয়া **হৃৎপিণ্ড** (heart) অবস্থিত।

(৪) **উদর গহ্বর** (abdominal cavity)—ইহা মধ্যশরীরের নীচের দিকে থাকে। দেহকাণ্ডের উপরের ও নীচের এই দুই ভাগকে আলাদা করিয়া রাখিয়াছে একটি ছাতার মত পেশীর্ আবরণ, যাহাকে **মধ্যচ্ছদা** (diaphragm) বলা হয় (চিত্র ৫৬)। গ্রাসনালী এই আবরণ ভেদ করিয়া নীচে যাইয়া **পাকস্থলীর** (stomach) সহিত মিলিয়াছে। ইহা ছাড়া **অন্ত্র** (intestine), **প্লীহা** (spleen), **যকৃৎ** (liver), **অগ্ন্যাশয়** (pancreas), **বৃক্ক** (kidney), **বস্তি** (bladdar) এবং **জননেন্দ্রিয়** (reproductive organs) এই গহ্বরের ভিতরে থাকে।

হস্তপদাদি অঙ্গ (upper and lower limbs)—ইহারা মধ্যশরীরের শাখার মত। ইহার তিনটি ভাগ আছে, যথা, **প্রগণ্ড** (upper arm), **প্রকোষ্ঠ** (fore arm), ও **হস্ত** (hand)। প্রত্যেক হস্তে পাঁচটি আঙ্গুল আছে এবং উহাদের নাম অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা।

পদেরও তিনটি অংশ আছে, যথা, **উরু** (thigh), **জঙ্ঘা** (shank) ও **চরণ** (foot)। প্রত্যেক চরণেও পাঁচটি করিয়া আঙ্গুল আছে।

এইবার কয়েকটি উপাদানের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

১। অস্থি ও কঙ্কাল (Bones and Skeleton)

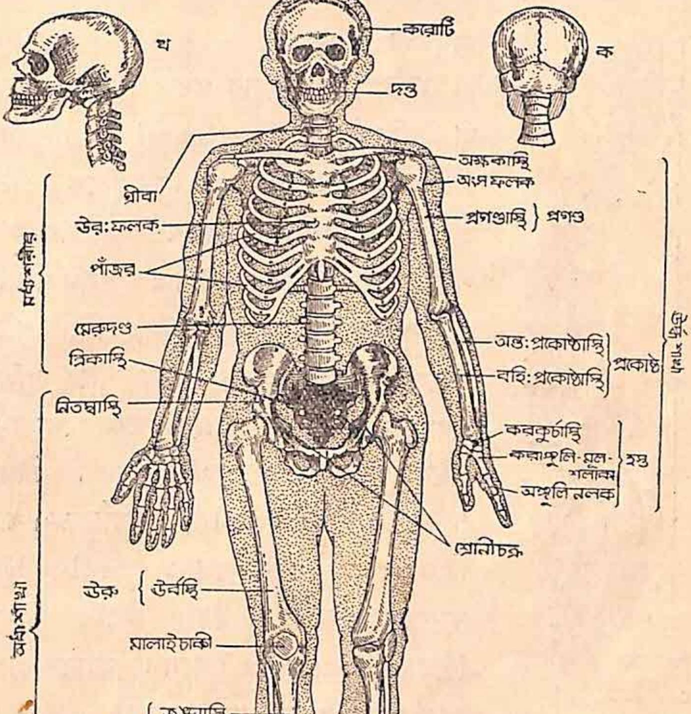
মানবদেহে ২০৬ খানি হাড় আছে। এই হাড়গুলি দিয়া **নরকঙ্কাল** গঠিত। হাত ও পায়ের হাড়গুলি সাধারণতঃ লম্বা ও ফাঁপা নলের মত

কিন্তু ইহাদের প্রান্তগুলির ভিতরটা অনেকটা মৌচাকের মত হইয়া থাকে (চিত্র ৪৮)। ফাঁপা অংশের মধ্যে **পীত মজ্জা** (yellow marrow) ও প্রান্তে **লোহিত মজ্জা** (red marrow) থাকে। মজ্জা শোণিত-কোষ (blood cells) ও মেদ-কোষ (fat cells) দিয়া গঠিত। মাথা ও বুকের হাড়গুলির অধিকাংশ আকারে চেপ্টা। ইহাদের মাঝখান মৌচাকের মত ও উহাতে লোহিত মজ্জা থাকে। হাড়ের উপরের অংশ শক্ত এবং এই শক্ত অংশের বাহিরে **পেরিয়ষ্টিয়াম** (periosteum) নামে একটি পাতলা আবরণ আছে। হাড়ের সংযোগস্থলকে **সন্ধি** (joint) বলে। প্রত্যেক সন্ধিতে দুইখানি হাড়ের শেষাংশ কতকগুলি কলা দিয়া জোড়া থাকে। এই কলাগুলিকে **সন্ধিবন্ধনী** (ligament) বলে (চিত্র ৪৮)। প্রত্যেক সন্ধিতে হাড়ের শেষাংশ **তরুণাস্থি** (cartilage) দিয়া গঠিত বলিয়া উহা ঘর্ষণের ফলে ক্ষয়িয়া যায় না। তরুণাস্থি হাড় অপেক্ষা নরম ও স্থিতিস্থাপক (elastic) এবং উভয়ের উপাদান প্রায় একই রকমের। ইহা ছাড়া একপ্রকার হড়হড়ে তরল পদার্থ সন্ধিগুলিকে ভিজাইয়া রাখে।



৪৮। সন্ধিবন্ধনী

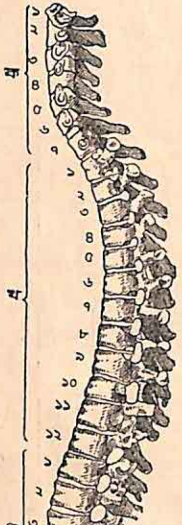
নরকঙ্কালকেও (চিত্র ৪৯) প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে, যেমন, (১) **করোটি** (skull), (২) **মধ্যশরীর** (trunk) এবং (৩) **ঊর্ধ্ব ও অধঃশাখা** (upper and lower extremities)।



৪৯। নরকঙ্কাল

করোটি—ইহা মাথার মধ্যে চর্মের নীচে অবস্থিত (চিত্র ৪৯)। করোটিকা (cranium) বা মাথার খুলি ও মুখমণ্ডল লইয়া ইহাতে মোট ২২ খানি হাড় আছে। মাথার খুলির মধ্যে মস্তিষ্ক

থাকে। ইহা ছাড়া করোটি চোখ, কান, নাক, দাঁত, জিহ্বা প্রভৃতির আধার।



৫০। মেরুদণ্ড ; গ্রীবা (ক), পৃষ্ঠ (খ), ও কটির (গ) কশেরুকা ; ত্রিকাস্থি (ঘ) ও অনুত্রিকাস্থি (ঙ)

মধ্যশরীর—ইহার প্রধান অংশ **মেরুদণ্ড** বা **শিরদাঁড়া** (vertebral column) (চিত্র ৫০)। শরীরের পিছনদিকে গ্রীবা হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য শরীরের শেষ অংশ পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। ইহা ৩৩ খানি খণ্ডাস্থি বা **কশেরুকা** (vertebra) দিয়া গঠিত হইলেও ইহাতে ২৬ খানি হাড় আছে বলিয়া গণনা করা হয়। হাড়গুলিকে মোটামুটি এইভাবে হিসাব করা হইয়া থাকে। **গ্রীবায়** ৭ খানি (cervical), **পৃষ্ঠে** ১২ খানি thoracic) ও **কটিতে** ৫ খানি (lumber) কশেরুকা আছে। ইহার নীচের অংশকে ত্রিকাস্থি (sacrum) বলে। ইহাতে একটি হাড় আছে বলিয়া ধরা হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ৫টি কশেরুকার সমষ্টি। মেরুদণ্ডের শেষাংশের নাম **অনুত্রিকাস্থি** (coccyx)। ইহাতেও ৪টি হাড় জুড়িয়া গিয়া ১টি হইয়াছে। মেরুদণ্ড নমনীয় এবং উহার হাড়গুলি একটির উপর অপরটি, এভাবে সাজান থাকে। ইহার মধ্যে নলের মত একটি পথ আছে। এই পথে **সুষুম্নাকাণ্ড** বা মেরুমজ্জা (spinal cord) অবস্থিত। এই মেরুদণ্ডই মানব-দেহের অবলম্বন, কারণ ইহার সহিত দেহের অন্যান্য অংশগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জোড়া থাকে।

মেরুদণ্ডের সঙ্গে ১২ জোড়া **পাঁজর** (ribs) জোড়া থাকিয়া একটি বক্ষঃপিঞ্জরের সৃষ্টি করে। তার মধ্যে ১০ জোড়া পাঁজর দুই পাশ দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া বুকের মাঝখানে **উরঃফলক** (sternum) নামে একটি হাড়ের সঙ্গে তরুণাস্থি দিয়া জোড়া (চিত্র ৪৯)। অপর ২ জোড়া পাঁজর বুকের দিকে জোড়া থাকে না। মধ্যশরীরের এই অংশে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, শ্বাসনালী, অন্ননালী প্রভৃতি যন্ত্র থাকে।

উর্ধ্বশাখা—প্রত্যেক উর্ধ্বশাখা কণ্ঠাস্থি (clavicle) ও অংশফলক (scapula) নামে দুইটি হাড় দিয়া মধ্যশরীরের সঙ্গে জোড়া থাকে। কণ্ঠাস্থি সামনের দিকে উরঃফলকের সঙ্গে এবং অংশফলক একটি পেশী দিয়া মেরুদণ্ডের সঙ্গে জোড়া। শাখার প্রগণ্ডে ১ খানি, প্রকোষ্ঠে ২ খানি ও হস্তে ২৭টি হাড় আছে। হস্তের হাড়গুলির আবার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে (চিত্র ৪৯)।

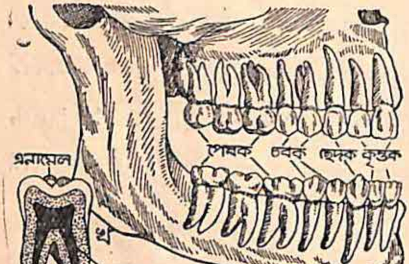
অধঃশাখা—প্রত্যেক অধঃশাখা একখানি নিতম্বাস্থি (hip bone) দিয়া মধ্যশরীরের সঙ্গে জোড়া থাকে। ইহা ছাড়া শাখার উরুতে ১টি, জঙ্ঘায় ২টি, উরু ও জঙ্ঘার সংযোগস্থলে সামনে একটি চেপ্টা **মালাইচাকী** (petella) ও চরণে ২৬ খানি হাড় আছে। হস্তের হাড়ের মত ইহাদেরও ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে (চিত্র ৪৯)।

দুইটি অধঃশাখার দুইটি নিতম্বাস্থি সামনের দিকে জুড়িয়া গিয়া ১টি **শ্রোণীচক্রের** (pelvis) সৃষ্টি করে (চিত্র ৪৯)। শ্রেণীচক্র পিছনের দিকে ত্রিকাস্থির সঙ্গে জোড়া।

গ্রীবা ও করোটির সংযোগস্থলে সামনের দিকে **হাইওয়েড** (hyoid) নামে একটি হাড় আছে। ইহা ছাড়াও প্রত্যেক কানের মধ্যে ৩টি করিয়া ছোট হাড় থাকে। এইরূপে ২০৬ খানি হাড়ের হিসাব পাওয়া যায়।

২। দন্ত (Tooth)

মানুষের মুখগহ্বরের মধ্যে দুই পাটি দাঁত থাকে। প্রত্যেক দাঁতের তিনটি করিয়া অংশ আছে। একটি অংশ মাড়ির উপরে, একটি ভিতরে এবং আর একটি চোয়ালের হাড়ের মধ্যে থাকে। মাড়ির উপরের কঠিন ও উজ্জ্বল অংশকে **এনামেল** বলে। ইহার বাকী অংশ হাড়ের মত এক রকম শক্ত পদার্থে নির্মিত। দাঁতের ভিতরকার অংশ ফাঁপা এবং নরম দন্তমজ্জায় পূর্ণ থাকে। এইখানে নার্ভ, রক্তনালী প্রভৃতি আছে। মানুষের জীবনে দুইবার দাঁত উঠে। শিশুর জন্মের পর



৫১। দন্ত

৬ মাস হইতে ২ বৎসরের মধ্যে ২০টি অস্থায়ী দুধে দাঁত দেখা দেয়। আবার ৫-৭ বৎসর হইতে দুধে দাঁত পড়িয়া গিয়া ১২ বৎসরের মধ্যে ২৮টি ও ৩০ বৎসরের মধ্যে আরও ৪টি স্থায়ী দাঁত উঠে। ৩২টি স্থায়ী দাঁতের মধ্যে উপরের চোয়ালে ১৬টি ও নীচের চোয়ালে ১৬টি দাঁত থাকে। প্রত্যেক চোয়ালের সামনে ৪টি **কৃন্তক** (incisor), ইহাদের দুই পাশে ২টি **ছেদক** (canine), তাহাদের দুই পাশে ২টি করিয়া ৪টি **চর্বক** (premolar) ও শেষে ৩টি করিয়া ৬টি **পেষক** (molar) দাঁত দেখা যায়। এই দাঁতগুলির কাজ হইল খাদ্যকে কাটিয়া, ছিঁড়িয়া ও পিষিয়া নরম করা (চিত্র ৫১)।

৩। পেশী (Muscle)

মানবদেহের চর্ম ও মেদ উঠাইয়া ফেলিলে যে ঈষৎ লালচে রংয়ের নরম মাংসল অংশ দেখা যায় তাহাকেই **পেশী** বলে (চিত্র ৫২)। অধিকাংশ পেশীরই মাঝখান মোটা ও উহার প্রান্ত দুইটি চেপ্টা ও সাদা রংয়ের। এই চেপ্টা অংশগুলির নাম **কণ্ডরা** (tendon)। কণ্ডরার সাহায্যেই পেশীগুলি কঙ্কালের হাড়ের সঙ্গে লাগান থাকে। চলাফেরা করা অথবা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির চালনা পেশীর সাহায্যেই হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া পেশীর মধ্যে শরীরের উদ্বৃত্ত খাদ্য শর্করা-রূপে জমা থাকে। পেশী স্থিতিস্থাপক অর্থাৎ টিপিলে বসিয়া যায় কিন্তু ছাড়িয়া দিলেই আগেকার অবস্থায় ফিরিয়া আসে। ইহা সংকুচিত ও প্রসারিত হইতে পারে। ইহা ছাড়া পেশীর নিজস্ব বোধশক্তি, মরণ-সংকোচ প্রভৃতি আরও কয়েকটি গুণ আছে। পেশীগুলিকে তাহাদের কাজ ও অবস্থানের উপর **ঐচ্ছিক পেশী** (voluntary muscle) ও **অনৈচ্ছিক পেশী** (involuntary muscle) এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। ঐচ্ছিক পেশী সাধারণতঃ হাড়ের গায়ে লাগিয়া থাকিয়া আমাদের ইচ্ছা অনুসারে সংকুচিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে। অনৈচ্ছিক পেশী অর্থাৎ যাহারা শিরা, ধমনী, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড,



৫২। মাংসপেশী

অন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রের গায়ে থাকে, তাহাদের কাজ আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

৪। মেদ (Fat)

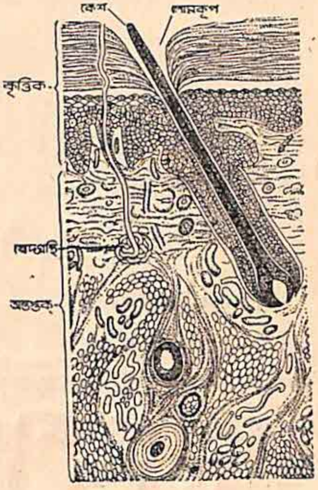
চর্মের নীচে ও মাংসপেশীর উপরে যে সাদা রংয়ের তৈলাক্ত পদার্থের আবরণ থাকে তাহাকে **মেদ** বা **চর্বি** বলে। শরীরকে নরম রাখাই মেদের প্রধান কাজ। ইহা শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি করে ও দেহে কর্মশক্তি দেয়।

৫। চর্ম (Skin)

মেদের বাহিরে দেহের আবরণকে **চর্ম** বা **ত্বক্‌** বলে। ইহাতে কয়েকটি স্তর দেখা যায়। দেহের কোন কোন অংশে অধিকাংশ সময়ে ঘর্ষণের ফলে চর্মের বাহিরের অংশ ক্রমশঃ শক্ত হইয়া **নখের** সৃষ্টি করে। নখের তলায় ও পিছনের দিকে রক্তবহা-নালী থাকে বলিয়া নখের বৃদ্ধি হয়।

কাজের বিভাগ ও প্রকৃতি হিসাবে চর্মকে প্রধানতঃ দুইটি স্তরে ভাগ করা হইয়াছে, যথা, (১) **কৃত্তিক** (cuticle or epidermis) ও (২) **অন্তস্তক্‌** (dermis)। চর্মের উপরিভাগকে কৃত্তিক বলে। কৃত্তিকের বাহিরের অংশে চেপ্টা আকারের অসংখ্য কোষ আছে এবং এই স্তরটি সময়ে সময়ে শক্ত হইয়া যায়। কৃত্তিকের নীচে অন্তস্তক্‌ অবস্থিত। ইহাতে নার্ভ, ধমনী, শিরা, ঘর্মগ্রন্থি, লসিকাগ্রন্থি, লোমকূপ ও উহাদের খাড়া রাখিবার জন্য পেশী প্রভৃতি দেখা যায়। এই অংশ কোন রকমে আহত হইলে রক্তপাত ও যন্ত্রনা অনুভব হইয়া থাকে।

চর্ম আমাদের দেহের নানারূপ কাজ করিয়া থাকে। ইহা দেহকে ঢাকিয়া রাখিয়া ভিতরকার কোমল অংশগুলিকে সকল রকম আঘাত হইতে রক্ষা করে। চাপ, ব্যথা, স্পর্শ, উত্তাপ, শৈত্য প্রভৃতির অনুভূতি চর্মের দ্বারাই হইয়া থাকে। জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য দেহ-মল ঘামের সহিত চর্ম দিয়া বাহির হইয়া যায় এবং তাপ পরিবহণ ও বিকিরণের দ্বারা চর্ম দেহের স্বাভাবিক উত্তাপের সমতা বজায় রাখে।



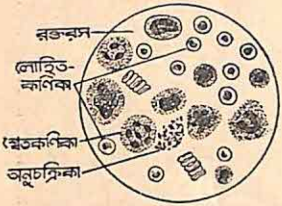
৫৩। চর্মের অভ্যন্তর

চর্মের উপরিভাগে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র দেখা যায়। ইহাদের **লোমকূপ** বলে। দেহের দূষিত পদার্থ এই লোমকূপ দিয়াই বাহির হইয়া যায়। ইহা ছাড়া অন্তস্তকের ভিতরে ঘামাচির মত ছোট টবে এক একটি কেশ বসান থাকে। এই টবের মধ্যে নার্ভ, ধমনী প্রভৃতি থাকে। চুলের গোড়া ছাড়া আর কোথাও নার্ভ নাই বলিয়া চুল কাটিবার সময় ব্যথা লাগে না।

৬। রক্ত (Blood)

দেহের মধ্যে ধমনী, শিরা ও হৃৎপিণ্ডের ভিতর দিয়া যে উজ্জ্বল লাল রংয়ের তরল পদার্থ সকল সময়ে সঞ্চালিত হইতেছে তাহারই নাম রক্ত বা **শোণিত**। ইহার দ্বারা শরীরের বিভিন্ন কলার পুষ্টি হয় ও

দূষিত পদার্থ যাহা কলা হইতে পরিত্যক্ত হয় তাহা শরীর হইতে বাহির করিয়া দিতে ইহা সাহায্য করে। অণুবীক্ষণের সাহায্যে রক্তে তিন রকমের কণিকা দেখা যায়, যথা, (১) **শ্বেত কণিকা** (white blood corpuscles), (২) **লোহিত কণিকা** (red blood corpuscles) ও **অনুচক্রিকা** (platelets)। ইহারা **রক্তরস** (plasma) নামে একরকম ঈষৎ হল্‌দে রংয়ের তরল মাধ্যমে ভাষিয়া থাকে। লোহিত কণিকায় **হিমোগ্লোবিন** (hæmoglobin) নামে লাল রংয়ের একরকম পদার্থ থাকে। ইহা বাতাস হইতে অক্সিজেন টানিয়া লইয়া সেই অক্সিজেন দেহকোষে পরিবেশন করে।



৫৪। অণুবীক্ষণের সাহায্যে রক্তের কণিকাগুলিকে এইরূপ দেখা যাইবে

৭। লসিকা (Lymph)

দেহের বিভিন্ন কলা হইতে আর একপ্রকার স্বচ্ছ অথবা ফিকা হলুদ রংয়ের তরল পদার্থ কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম ও বিশিষ্ট নালিকা পথে প্রবাহিত হয়। ইহারই নাম **লসিকা**। ইহা রক্তরস হইতে উৎপত্তি হইয়া থাকে। লসিকানালীর (lymphatic vessel) ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহা একরকম গ্রন্থিতে ফিরিয়া আসে যাহাকে **লসিকাগ্রন্থি** (lymphatic vessel) বলে। লসিকাগ্রন্থি হইতে ইহা পুনরায় রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। লসিকা শরীরের বিভিন্ন অংশের পুষ্টিসাধন করে।

৮। নার্ভ (Nerve)

মাথার করোটির মধ্যে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের ভিতর সুষুম্নাকাণ্ড থাকে ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই মস্তিষ্ক হইতে ১২ জোড়া ও সুষুম্নাকাণ্ড হইতে ৩১ জোড়া সাদা সূতার মত **নার্ভ** শরীরের যাবতীয় যন্ত্রসমূহে জালের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি নার্ভ অন্তর্মুখী ও অপরগুলি বহির্মুখী। রাজ্যের শাসনকর্তার মত ইহারা আমাদের দেহ-মনের প্রত্যেকটি গতি, অনুভূতি, চেষ্টা প্রভৃতি দেহের প্রত্যেক ব্যাপারটির পরিচালন ও তদারক করিতেছে।

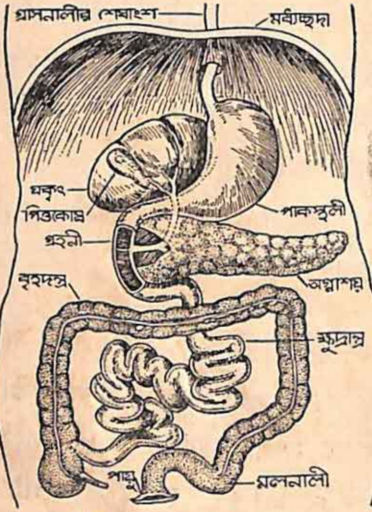
এইবার বিভিন্ন তন্ত্রগুলির মধ্যে কেবল **পাচন-তন্ত্র, শ্বসন-তন্ত্র** ও **রেচন-তন্ত্রের** বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

(ক) পাচন-তন্ত্র (Digestive System)

মধ্যশরীরের ভিতরে প্রায় ১৬ হাত লম্বা একটি আঁকা-বাঁকা নলের মধ্যে আমাদের পরিপাক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার নাম **পৌষ্টিক নালী** (alimentary canal)। পৌষ্টিক নালীর প্রথমাংশে মুখ-গহ্বর ও শেষাংশে পায়ু (anus) অবস্থিত। ইহার আশেপাশে কয়েকটি রসগ্রন্থি (gland) আছে এবং তাহাদের সঙ্গে পৌষ্টিক নালী সংযুক্ত। পৌষ্টিক নালী ও উহার সহিত যুক্ত গ্রন্থিগুলিকে লইয়া পাচন-তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

আমরা মুখের মধ্যে দন্তের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্যকে কাটিয়া, ছিঁড়িয়া ও পিষিয়া নরম করি। জিহ্বা নড়াচড়া করিয়া এই বিষয়ে দন্তকে সাহায্য করে। মুখ-গহ্বরের মধ্যে তিন জোড়া গ্রন্থি আছে। উহা হইতে লালা (saliva) এই সময়ে বাহির হইয়া খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিশিয়া যায়। ফলে খাদ্যদ্রব্য অনেকটা মণ্ডের মত দেখায়। লালা

ক্ষারধর্মী এবং উহাতে টায়ালিন (ptyalin) নামে একরকম জারক থাকে যাহা শ্বেতসারকে (starch) আংশিকভাবে জীর্ণ করে। জিহ্বার সাহায্যে আমরা খাদ্যের স্বাদ পাইয়া থাকি এবং উহা এই চর্বিত খাদ্যকে ফারিংসের ভিতর দিয়া গ্রাসনালীর মধ্যে ঠেলিয়া দেয়। এই সময়ে অধিজিহ্বা শ্বাসনালীর মুখটি ঢাকিয়া রাখে বলিয়া উহার মধ্যে খাদ্য প্রবেশ করিতে পারে না। গ্রাসনালী দিয়া চর্বিত খাদ্য ক্রমশঃ **পাকস্থলীতে** পৌঁছায়। পাকস্থলীর আকার অনেকটা ভিস্তির মশকের মত। ইহার ভিতরে প্রাচীরের গায়ে অসংখ্য গ্রন্থি আছে। গ্রন্থি হইতে অম্ল পাচক-রস বাহির হইয়া আসে। পাচক-রসের প্রধান উপাদান হইল হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও পেপ্‌সিন প্রভৃতি কিন্বসত্ব (enzyme)। ইহাদের সাহায্যে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য আংশিক ভাবে জীর্ণ হইয়া থাকে। পাকস্থলী হইতে প্রায় ৬ ঘণ্টা পরে খাদ্য অর্ধজীর্ণ অবস্থায় **ক্ষুদ্রান্ত্রের** প্রথমাংশ গ্রহণীতে (duodenum) প্রবেশ করে। এইখানে অগ্ন্যাশয় হইতে **অগ্ন্যাশয় রস** (pancreatic juice) এবং যকৃৎ হইতে **পিত্ত** (bile) দুইটি নলের ভিতর দিয়া গ্রহণীতে আসিয়া হাজির হয়। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্রান্ত্র হইতেও **আন্ত্রিক রস** (succus entericus) বাহির হইতে থাকে। এই তিন রকমের



৫৫। পৌষ্টিকনালী ও উহার সংলগ্ন গ্রন্থিসমূহ

জারক রস অর্ধজীর্ণ খাদ্যের সহিত মিশিয়া যায় ও উহাকে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ করে। এই সময়ে ক্ষুদ্রান্ত্রের পেশীগুলি পর্যায়ক্রমে সংকুচিত ও প্রসারিত হইতে থাকে। সেই কারণে খাদ্য জীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমশঃ **বৃহদন্ত্রের** দিকে আগাইয়া যায়। পিত্তে কোনরূপ কিন্বসত্ত্ব নাই। ইহা স্নেহ-জাতীয় পদার্থ জীর্ণ ও শোষিত হইতে সাহায্য করে। অগ্ন্যাশয় রসে ইনসুলিন (insulin) নামে একপ্রকার পদার্থ থাকে যাহা চিনিকে সম্পূর্ণরূপে দহন করিয়া দেহের তাপের সৃষ্টি করে। ইহা ছাড়া অগ্ন্যাশয় রসে শ্বেতসার ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্যকে হজম করিবার জন্য ভিন্ন রকমের কিন্বসত্ত্ব আছে। আন্ত্রিক রসেও কয়েক প্রকার কিন্বসত্ত্ব থাকে যাহা প্রোটিনকে হজম করে এবং ইক্ষু চিনিকে দ্রাক্ষা শর্করায় (glucose) পরিণত করে।

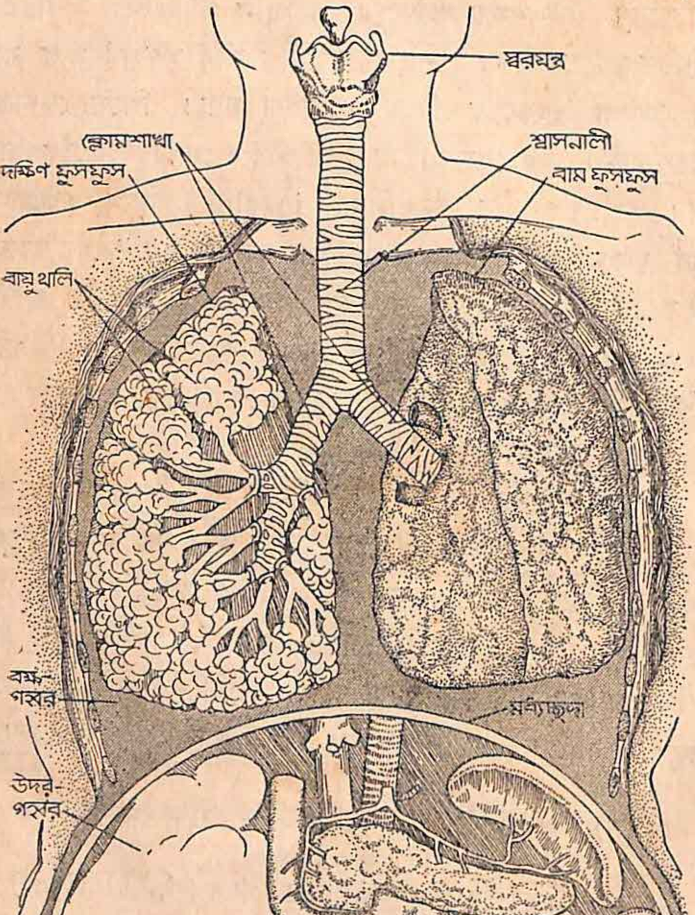
ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুঁয়ার মত অনেক শোষণ-যন্ত্র আছে। তাহাদের সাহায্যে জীর্ণ খাদ্য শোষিত হইয়া রক্ত-জালকের মধ্যে প্রবেশ করে। খাদ্যের অসার তরল অংশ যাহা পড়িয়া থাকে তাহা ক্রমশঃ বৃহদন্ত্রে আসিয়া হাজির হয়। এইখানে কেবল জল শোষিত হয় এবং জীর্ণ খাদ্যের কঠিন অংশ যাহা পড়িয়া থাকে তাহা মলরূপে মলনালী (rectum) হইয়া পায়ু দিয়া বাহির হইয়া যায়।

(খ) **শ্বসন-তন্ত্র (Respiratory System)**

আমরা শ্বাস-কার্যের সময় অক্সিজেন গ্রহণ (inhalation) ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ (exhalation) করি। প্রধানতঃ ছয়টি যন্ত্রের সাহায্যে শ্বাস-কার্য হইয়া থাকে, যথা,—**নাসাপথ, ফারিংক্স, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালী, ফুসফুস** ও **মধ্যচ্ছদা**।

(১) নাসাপথ ও (২) ফারিংক্সের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে

(চিত্র ৪৭)। (৩) স্বরযন্ত্র বা লারিংক্স (larynx) ফারিংক্সের



৫৬। স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালী, ক্লোমশাখা ও ফুসফুস ; মধ্যচ্ছদা বক্ষোগহ্বরকে উদর-গহ্বর হইতে পৃথক রাখিয়াছে

পরেই শ্বাসনালীর প্রথমাংশে থাকে। খাদ্য খাইবার সময় আপনা

হইতেই অধিজিহ্বা এই পথ বন্ধ করে, নচেৎ বিষম লাগে। (৪) **ক্লোমনালী** বা **শ্বাসনালী** (wind-pipe or trachea) স্বরযন্ত্রের পরে অবস্থিত। একটু নীচে গিয়া ইহা দুই ভাগে ভাগ হইয়াছে। এই দুইটি নালীর নাম **ক্লোমশাখা** (bronchus)। শ্বাসনালী ও ক্লোমশাখা দেখিতে নলের মত। ইহাদের সামনের অংশ অর্ধাঙ্গুরীর আকারের অনেকগুলি তরুণাস্থি দিয়া গঠিত কিন্তু উহার পিছনের ভাগে তরুণাস্থি নাই। ক্লোমশাখা ফুসফুসে যাইয়া শেষ হইয়াছে। (৫) বুকের দুই পাশে দুইটি **ফুসফুস** আছে। ইহারা **ফুসফুসধরা কলা** (pleura) নামে একপ্রকার পাতলা আবরণ দিয়া ঢাকা থাকে। দক্ষিণ ফুসফুস তিন ভাগে ও বাম ফুসফুস দুই ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ডে আঙ্গুরের থোকার মত বায়ুথলি আছে। ফুসফুসের দেহ স্পঞ্জের মত ফোঁপরা। বায়ুথলির গা অতি সূক্ষ্ম ও তাহাতে অসংখ্য জালক (capillaries) থাকে। (৬) **মধ্যচ্ছদা** বুক ও পেটের মাঝখানে অবস্থিত ও মাংসপেশীর দ্বারা গঠিত ছাতার মত পর্দা বিশেষ।

শ্বাসকার্য—পাঁজরের পেশীগুলির সংকোচন ও প্রসারণের ফলে **উরঃফলক** বাহিরের দিকে আগাইয়া যায় এবং বক্ষোগহ্বরের আয়তন বাড়িয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে মধ্যচ্ছদাও সংকুচিত হইয়া দুই পাশে নামিয়া পড়ে। ফলে ফুসফুসের ভিতরকার বায়ুর চাপ কমিয়া যায়। তখন বাহিরের ও ভিতরের বায়ুর চাপের সমতা রক্ষা করিবার জন্য বাহিরের বায়ু নাসাপথ ও শ্বাসনালী দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। চাপ সমান হইলে আপনা হইতেই বায়ু প্রবেশ বন্ধ হইয়া যায়।

পেশীমাত্রই সংকোচনের পরে প্রসারিত হইতে চায়। সেইজন্য মধ্যচ্ছদা ও পাঁজরের পেশী আবার আগেকার অবস্থায় ফিরিয়া আসে ও

বক্ষোগহ্বরের আয়তন ছোট হয়। ফলে ভিতরের বাতাস নাক দিয়া বাহির হইয়া যায়।

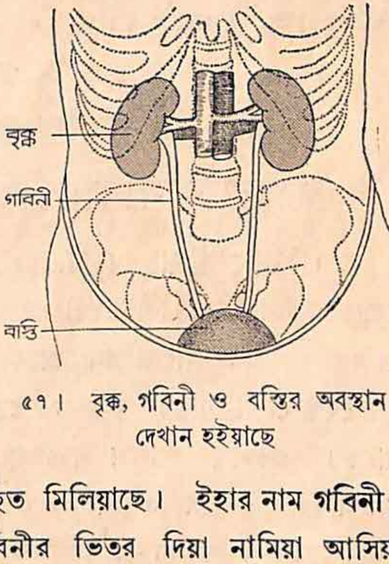
বিশুদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনী ও উহার শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়া শরীরের মধ্যে সঞ্চালিত হইবার সময় দেহের বিভিন্ন স্থানের কোষগুলি হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড শুষিয়া লয় এবং ক্রমশঃ দূষিত হইয়া পড়ে। এই দূষিত রক্ত শিরা ও উহার শাখা-প্রশাখাগুলির সাহায্যে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। পরে হৃৎপিণ্ড হইতে এই রক্ত শোধনের জন্য ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে। ফুসফুসের মধ্যে যে সকল বায়ুথলি আছে তাহাদের প্রাচীরের ভিতরের জালকের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় এই রক্ত শোধিত হয়। প্রশ্বাস গ্রহণের সময় বিশুদ্ধ বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং বায়ুথলিগুলির প্রাচীরে অবস্থিত জালকের সংস্পর্শে আসে। জালকের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় দূষিত রক্তের লোহিত কণিকাগুলি হিমোগ্লোবিনের সাহায্যে এই বায়ু অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং বিনিময়ে উহার দূষিত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও কিছু জলীয় বাষ্প পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প সমেত দূষিত এবং উত্তপ্ত বায়ু নিঃশ্বাসের সময় ফুসফুস হইতে বাহির হইয়া যায়। এইরূপে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিনিময় হইয়া থাকে। শোধিত রক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে এবং উহা হইতে পুনরায় শরীরের মধ্যে সঞ্চালিত হয়।

(গ) রেচন-তন্ত্র (Excretory System)

দেহ হইতে নানাপ্রকার দূষিত ও অসার পদার্থগুলি মল, মূত্র ও ঘর্মের সহিত নিয়মিতভাবে বাহির হইয়া যায়। এই কারণে আমরা

সুস্থ থাকিতে পারি। মলনালী (rectum), বৃক্ক (kidney), গবিনী (ureter) ও বস্তি (bladder) এবং স্বেদগ্রন্থি (sweat gland) প্রভৃতির বর্ণনা ও কার্যকরিতা রেচন-তন্ত্রের অন্তর্গত। ঘর্মের কার্যকরিতা এবং মলের গঠন ও ত্যাগের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সেইজন্য এখানে শুধু মূত্রের কথাই আলোচনা করা হইল।

মেরুদণ্ডের কটিদেশের দুই পাশে উদর-গহ্বরের মধ্যে দুটি বৃক্ক থাকে। ইহারা দেখিতে অনেকটা শিমের বীজের মত। ইহার মধ্যে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূত্রনালিকা আছে। ইহা ছাড়া অসংখ্য রক্ত-জালক ইহার মধ্যে ছড়াইয়া আছে। দূষিত রক্ত-জালকের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় আবর্জনাগুলি নালিকাগুলির মধ্যে মূত্রের আকারে ত্যাগ করে। প্রত্যেক বৃক্ক হইতে একটি করিয়া নল নীচের দিকে নামিয়া গিয়া **বস্তির** সহিত মিলিয়াছে। ইহার নাম **গবিনী**।



৫৭। বৃক্ক, গবিনী ও বস্তির অবস্থান দেখান হইয়াছে

বৃক্কের নালিকাগুলি হইতে গবিনীর ভিতর দিয়া নামিয়া আসিয়া বস্তির ভিতরে মূত্র অনবরত জমা হয়। বৃক্ক হইতে মূত্র প্রধানতঃ গবিনীর পেশী সংকোচনের ফলেই গবিনীর মধ্যে প্রবেশ করে। বস্তি দেখিতে একটি থলির মত। ইহার প্রাচীর পেশীর দ্বারা তৈয়ারী। ইহাতে প্রায় দেড় পোয়া মূত্র সঞ্চিত থাকিতে পারে। মূত্রনালী (urethra) বস্তির নিম্নে সামনের দিকে অবস্থিত। বস্তিতে পরিমিত

মূত্র জমিলে বস্তির পেশী সংকোচনের জন্য বেদনা বোধ হয় ও মূত্রত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। মূত্রনালীর গোড়ায় পেশীর সংকোচনের জন্য সকল সময়ে মূত্র বাহির হইতে পারে না। একবার ইচ্ছা হইলেই বস্তি হইতে মূত্র ত্যাগ হইয়া থাকে।

লোকে প্রত্যহ প্রায় ৫০ আউন্স মূত্র ত্যাগ করে। ইহা অনেক সময়ে ঈষৎ হলুদ রংয়ের হইয়া থাকে। ইহাতে জল, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড প্রভৃতি নানাপ্রকার জৈব পদার্থ এবং লবণ ও নানাপ্রকার অজৈব পদার্থ পাওয়া যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

কয়েকটি সাধারণ ব্যাধির আলোচনা

১। **ম্যালেরিয়া** (Malaria)—ম্যালেরিয়ার মত ভয়ঙ্কর রোগ আর নাই। এই রোগের কারণ হইল একরকম জীবাণু। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সাধারণতঃ বর্ষা ও শরৎকালে খুব বেশী দেখা যায়। অন্যান্য ঋতুতে এই রোগের প্রকোপ কম থাকে। একমাত্র পশ্চিম বাঙলায় প্রতি বছর বিশ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় ভোগে ও প্রায় পঁচাত্তর হাজার লোক এই রোগে মারা যায়। শীত করিয়া গা কাঁপিয়া জ্বর আসা, হাত-পা ঠাণ্ডা হওয়া, পরে প্রচুর ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়া প্রভৃতি ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান লক্ষণ। রোগী বেশী দিন জ্বরে ভুগিলে দেহ দুর্বল ও রক্তহীন হইয়া পড়ে এবং যকৃৎ ও প্লীহা আকারে বড় হয়। এই রোগে প্রত্যহ কিংবা এক বা দুই দিন অন্তর একই সময়ে পালা করিয়া জ্বর আসে অথবা দিনের কোনও স্থির থাকে না।

ম্যালেরিয়ার জীবাণু মানুষ এবং এনোফিলিস জাতীয় স্ত্রী-মশার দেহের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ইহারা পরজীবী (parasite)। স্ত্রী-এনোফিলিস যখন রোগীকে স্থচ ফুটাইয়া নলের সাহায্যে রক্ত শুষিয়া লয় তখন ঐ রক্তের সহিত ম্যালেরিয়ার জীবাণু উহার পেটে প্রবেশ করে। মশার শরীরের ভিতর জীবাণুদের ৭।৮ দিন ধরিয়া বংশ-বৃদ্ধি হইয়া থাকে ও শেষে উহারা মশার লালা বাহির হওয়ার গ্রন্থিতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এই মশা পরে কোনও সুস্থ লোকের শরীরে রক্তপান করিবার জন্য বসে। রক্তপান করিবার সময় মশা ঐ জায়গায় খানিকটা থুতু ফেলে। এই থুতুতে এমন একটা জিনিস থাকে যাহার জন্য ঐ স্থানের রক্ত জমাট বাঁধে না। থুতুর সঙ্গে এনোফিলিস মশা তাহার লালা বাহির হওয়ার গ্রন্থি হইতে জীবাণুগুলিকে রক্তের সহিত মিশাইয়া দেয় এবং উহারা অনায়াসে রক্তের সঙ্গে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। রক্তের সঙ্গে ইহারা যকৃতে গিয়া হাজির হয়। তিন চার দিন পরে পুষ্ট হইয়া ইহারা যকৃৎ হইতে বাহির হইয়া আসে ও রক্তের লোহিতকণাগুলিকে আক্রমণ করে। এই সময়ে ইহাদের খুব তাড়াতাড়ি বংশ-বৃদ্ধি হয় ও রোগীর কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসে।

ম্যালেরিয়া কমাইতে হইলে বাসস্থানের চারিপাশের জঙ্গল ও আবর্জনা পরিষ্কার করাইতে হইবে। তাহার কারণ এনোফিলিস অন্ধকার জায়গায় থাকিতে ভালবাসে। ডোবা ও পুকুরের জলে কেরোসিন তৈল অথবা প্যারিস গ্রীন চূর্ণ ছড়াইলে উহারা জলের উপর একটি পাতলা আবরণের সৃষ্টি করে। এই আবরণ ভেদ করিয়া স্ত্রী-এনোফিলিস জলের মধ্যে ডিম পাড়িতে পারে না। উহার শূকও শ্বাস-কার্যের জন্য জলের বাহির হইতে বায়ু লইতে না পারিয়া

মরিয়া যায়। ঘরে ধূপ-ধূনা প্রভৃতি পোড়াইলে মশা সে ঘরে থাকিতে পারে না। D. D. T. নামক ঔষধ পিচকারীর সাহায্যে ছড়াইলে মশা মরিয়া যায়। রাত্রে মশারি ফেলিয়া শুইলে এনোফিলিস মশার আক্রমণ হইতে নিজকে রক্ষা করা যায়। ইহা ছাড়া কুইনিন প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করিয়া ম্যালেরিয়া রোগীকে আরোগ্য করিতে হইবে। তাহা হইলে এনোফিলিস নূতন করিয়া ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাইবে না। ম্যালেরিয়া মহামারী রূপে দেখা দিলে সপ্তাহে একটি করিয়া প্যালুড্রিনের বড়ি প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

২। **বসন্ত** (Small pox)—বসন্ত অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। এই রোগটি প্রতি বৎসর আমাদের দেশের বহু জায়গায় দেখা দেয়। ইহার জীবাণু বা ভাইরাস (virus) অণুবীক্ষণের সাহায্যেও দেখা যায় না। এই রোগের লক্ষণ হইল হঠাৎ কাঁপিয়া জ্বর আসা। রোগীর মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠে, সর্বাঙ্গ জ্বালা করে এবং মাথায়, ঘাড়ে ও কোমরে বেদনা বোধ হয়। তিন দিনের দিন রোগীর কপালে, ঘাড়ে ও কব্জিতে লাল গুটি দেখা দেয়। পরে শরীরের অন্যান্য স্থানে উহারা ছড়াইয়া পড়ে। পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই গুটিগুলি জলে ভরিয়া উঠে এবং আট দিনে গুটিগুলি পাকিয়া উহাতে পুঁজ হয়। ক্রমশঃ গুটিগুলি ক্ষতে পরিণত হয় ও শুকাইবার সময় তাহাদের উপর মামড়ি পড়ে।

রোগীর নাকের ও মুখের শ্লেষ্মায়, গুটির রসে বা মামড়িতে, রোগীর বিছানা, কাপড় প্রভৃতি ব্যবহৃত জিনিসে এবং শুশ্রূষাকারীদের জামা-কাপড়ে বসন্তের ভাইরাস থাকিয়া যায়। সুস্থ মানুষ এই সকল জিনিসের সংস্পর্শে আসিলে তাহার এই রোগ হইয়া থাকে। বসন্ত রোগ এমন কি বায়ু, মশা, মাছি প্রভৃতি দ্বারাও বিস্তারিত হইতে পারে।

প্রতিষেধক হিসাবে বসন্তের টিকা লইলে এই রোগ হয় না। ইহার প্রতিষেধক ক্ষমতা ২।৩ বৎসর থাকিলেও প্রতি বৎসরই টিকা লইলে ভাল হয়। শিশু জন্মাইবার ৬ মাসের মধ্যেই টিকা দেওয়া উচিত। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয়ে সাবধান হইলে এই রোগ প্রসার লাভ করিতে পারে না। বসন্ত রোগীকে কোনও হাসপাতালে পাঠান অথবা বাড়ীর কোনও আলাদা ঘরে মশারির মধ্যে রাখা উচিত। যতদিন পর্যন্ত মামড়ি উঠিতে থাকিবে ততদিন রোগী কাহারও সংস্পর্শে আসিবে না। মামড়িগুলি সাবধানে সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে অথবা কোনও তীব্র বীজবারকের দ্রবে (strong antiseptic solution) ডুবাইতে হইবে। রোগীর ও শুশ্রূষাকারীদের জামা কাপড় ভাল করিয়া বিশোধন (disinfection) করিতে পারিলে এই রোগ সংক্রামিত হইতে পারিবে না।

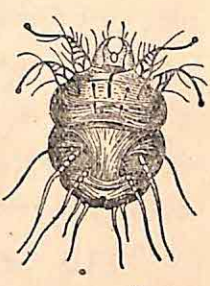
৩। **কলেরা** (Cholera)—'কমা ভিব্রিও' (Comma vibrio) নামে এক রকম জীবাণুর দ্বারা এই রোগের উৎপত্তি হয়। খাদ্য ও পানীয়ের সহিত ইহারা মানুষের পেটে প্রবেশ করিয়া এই ভয়াবহ সংক্রামক রোগের সৃষ্টি করে। রোগের সূচনায় প্রবলবেগে চাল ধোয়া জলের মত দাস্ত ও তাহার সঙ্গে বমি হইতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে রোগীর চোখ ও গলার স্বর বসিয়া যায়, প্রস্রাব অত্যন্ত কমিয়া যায় অথবা বন্ধ হয়, হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া আসে এবং হাত-পায়ে খিল ধরে। পরে জ্বর দেখা দেয় এবং রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। এই সময়ে রোগীর বমি, মল, থুতু প্রভৃতিতে অসংখ্য জীবাণু দেখা যায়। জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিবার কয়েক ঘণ্টা হইতে চার পাঁচ দিনের মধ্যেই রোগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে পারে। মাছি, পিঁপড়া ও অন্যান্য পতঙ্গের দ্বারা কলেরা বিস্তার লাভ

করে। ইহারা রোগীর মল-মূত্র প্রভৃতিতে বসিলে ইহাদের গায়ে কলেরার জীবাণু লাগিয়া যায়। ইহাদের দ্বারাই পরে খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য সংক্রামিত হইয়া পড়ে। অনেক সময়ে ধূলা-বালির সহিত মিশিয়া রোগীর মল ও বমির জীবাণু বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া খাদ্যদ্রব্যে পড়িলে উহা দূষিত হয়। ইহা ছাড়া যে সকল জলাশয়ে রোগীর সংক্রামিত জামা-কাপড় ধোয়া হয় তাহাদের জল পান করিলে কলেরা হইয়া থাকে।

নানা রকম উপায়ে এই রোগের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করা যাইতে পারে। দুধ ও জল ফুটাইয়া পান করা, খাবার জিনিস চাপা দিয়া রাখা, রোগীর বমি ও মল কোন পাত্রে রাখা এবং তাহা লাইসল, কার্বলিক এসিড প্রভৃতি তীব্র বিশুদ্ধীকরণ ঔষধের দ্বারা শুদ্ধি করা, শুশ্রূষাকারিগণের হাত-পা ভাল করিয়া ধুইয়া তবে খাবার বা পানীয় জিনিস গ্রহণ করা প্রভৃতি কলেরা রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা। প্রতি ছয় মাস অন্তর কলেরার টিকা লওয়া উচিত।

৪। **খোস-পাঁচড়া** (scabies)—এক প্রকার কীটের দ্বারা এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত সংক্রামক চর্মরোগ। কীটগুলি চর্মের উপরকার স্তর ভেদ করিয়া তাহার নীচে সুড়ঙ্গের মধ্যে বাস করে ও ডিম পাড়ে। ঐখানে চর্মের উপরে একটি ছোট ফুসকুড়ি দেখা দেয় ও তাহার মধ্যে পুঁজ জন্মায়। ডিমগুলি ক্রমে ফুসকুড়ির পুঁজে সংক্রামিত হয়। এই সময়ে ঐ স্থান চুলকাইতে থাকে এবং ডিমগুলি রস বা পুঁজের সঙ্গে নখের নীচে লাগিয়া থাকে। পরে অন্য জায়গা চুলকাইবার সময় ডিমগুলি চর্মের গায়ে লাগিয়া যায় এবং উহা হইতে নূতন কীটের জন্ম হয়। তাহারা আবার চর্ম ভেদ করিয়া নূতন রোগের সৃষ্টি করে।

যে সকল লোক খোস-পাঁচড়ায় ভুগিতেছে তাহাদের সংস্পর্শে আসিলে এই রোগ বিস্তার লাভ করে। রোগীর ব্যবহার করা গামছা, জামা-কাপড়, চাদর, বিছানা প্রভৃতি ব্যবহার করিলে এই রোগ ছড়াইতে পারে। ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহার করিবার আগে ভাল করিয়া বিশোধন করা উচিত। সকল সময়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিলে ও নিয়মিত নখ কাটিলে এই রোগ হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। রোগ হইলে প্রথম হইতেই গন্ধকজাত ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। ঔষধ লাগাইবার আগে আক্রান্ত স্থানগুলি ভাল করিয়া গরম জল ও কার্বলিক সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলা প্রয়োজন।



৫৮। খোস-পাঁচড়ার কীট

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আকস্মিক দুর্ঘটনা ও তাহার প্রাথমিক চিকিৎসা

(Accidents and first aid)

আকস্মিক দুর্ঘটনা মানব-জীবনে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ইহার জন্য পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারিলে আহত ব্যক্তির যথেষ্ট উপকার এমন কি প্রাণরক্ষা পর্যন্ত করা যাইতে পারে। দুর্ঘটনায় পড়িলে উহার সদ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হয় নচেৎ বিপদের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা করিবার পূর্বে আহত

ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসার দ্বারা সহায়তা করিতে পারিলে বিপদের আশঙ্কা কমিয়া যায় এবং রোগীও সুস্থ বোধ করে। ইহার জন্য গৃহে সকল সময়ে কিছু পরিষ্কার কাপড়, ব্যাণ্ডেজ, একটি কার্বলিক সাবান, সূতা, কাঁচি, সেফ্‌টিপিন, অল্প টিংচার আয়োডিন ও বেনজিন, বোরিক এসিড প্রভৃতি কয়েকটি অত্যাবশ্যক জিনিস সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। দুর্ঘটনা ঘটিলে কি প্রাথমিক চিকিৎসা করা কর্তব্য তাহার কয়েকটির কথা নীচে উল্লেখ করা হইল।

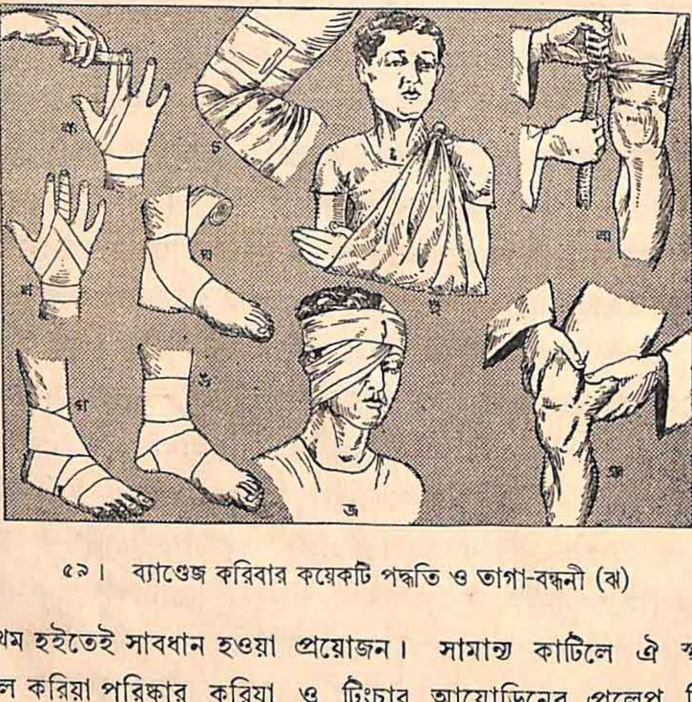
আগুনে পোড়া (Burns)—কাপড়ে আগুন লাগিলে আদৌ ছুটা-ছুটি করিতে নাই। সম্ভব হইলে লজ্জা না করিয়া তৎক্ষণাৎ কাপড়-জামা খুলিয়া ফেলিতে হয়। যদি তাহার সময় না থাকে তাহা হইলে কোনও কিছু ভারী জিনিস যেমন, লেপ, চট, কম্বল, মোটা কাপড় প্রভৃতি দিয়া কাপড়ের আগুনকে চাপা দিলে উহা বাতাসের অভাবে নিবিয়া যায়। আগুনে পোড়া অংশে জল বা বাতাস লাগা বিপজ্জনক। সামান্য পুড়িলে ঐস্থানে স্পিরিট, গরম ঘি বা নারিকেল তৈলের পটি দিলে রোগীর যন্ত্রণার কিছু উপশম হইয়া থাকে। দগ্ধস্থান বেশী হইলে অল্প গরম জলে এক চামচ খাইবার সোডা ও কিছু বোরিক এসিড মিশাইয়া উহাতে দগ্ধস্থান ভিজাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঐস্থানে যদি ফোস্কা পড়ে তাহা কখনও গালিয়া দিতে নাই। প্রাথমিক চিকিৎসার পর প্রয়োজন হইলে ডাক্তারের পরামর্শ লওয়া কর্তব্য।

২। **মচকানি ও হাড়ভাঙ্গা** (Sprain and fracture)—অনেক সময়ে অসাবধানতার জন্য হাত বা পায়ের সন্ধিস্থল মচকাইয়া যায় এবং শরীরের ভিতরকার সন্ধিবন্ধনী, পেশী অথবা কণ্ডরা দোমড়ানোর ফলে প্রসারিত হইয়া যায়। কোন কোন সময়ে সন্ধিবন্ধনী

ও ভিতরের ছোট ছোট শিরা ও ধমনী ছিঁড়িয়া গিয়া রক্তপাত হইয়া থাকে এবং হাড়ের সন্ধিগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে। চর্মের নীচে এই রকম রক্তপাত বেশ দেখা যায় এবং ইহাকে 'কালশিরা' পড়া বলে। সন্ধিস্থলের মধ্যে জলীয় অংশ জমা হইতে থাকে এবং ঐ জায়গা ফুলিয়া উঠে ও বেদনাদায়ক হয়। সম্ভব হইলে ঐ জায়গায় তৎক্ষণাৎ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলে বেশী ফুলিবার ভয় থাকিবে না (চিত্র ৫৯)। যাহাতে রক্ত চলাচল ভালভাবে হইতে পারে সেইজন্য ঐ জয়গা ধীরে ধীরে মালিশ করিয়া দিলে ভাল হয়। ভিতরকার হাড়ের কোনও ক্ষতি হইয়াছে কিনা তাহা এক্স-রের সাহায্যে নির্ধারণ করা উচিত। রোগী একটু সুস্থ হইলেই আঘাত প্রাপ্ত স্থানটি আস্তে আস্তে নাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা না হইলে ঐ জায়গা শক্ত হইয়া যাইতে পারে।

অনেক সময়ে পড়িয়া যাওয়ার ফলে ভিতরকার হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। ইহা দুই প্রকারের হইতে পারে, যথা,—**সরল হাড়ভাঙ্গা** (simple fracture) ও **জটিল হাড়ভাঙ্গা** (compound fracture)। প্রথম প্রকারের হাড়ভাঙ্গায় পেশী ও চর্ম ফাটিয়া ভিতরকার হাড় দেখা যায় না। জটিল হাড়ভাঙ্গায় পেশী ও চর্মের ভিতর দিয়া ভাঙ্গা হাড় বাহির হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ কোনও অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ লওয়া উচিত অথবা নিকটের কোনও হাসপাতালে রোগীকে লইয়া যাওয়া কর্তব্য। রোগীকে বেশী নড়াচড়া করিতে দিতে নাই। হাতে আঘাত লাগিলে গলার সহিত কাপড় বাঁধিয়া হাতটি তাহার ভিতর ব্যাণ্ডেজ করিয়া ঝুলাইয়া দিলে হাতের বিশ্রাম হয় (চিত্র ৫৯)। হাড় ভাঙ্গিলে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে একটি লম্বা কাঠের টুকরার সঙ্গে ভাঙ্গা জায়গা বাঁধিয়া দিলে সুবিধা হয়। পরে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

৩। কাটিয়া যাওয়া ও রক্তপড়া (Cut and hæmorrhage) —দেহের কোন অংশ কাটিয়া গেলেই ক্ষত হয়। বাতাসের বা ধূলাবালির সহিত নানাপ্রকার জীবাণু ঐ ক্ষতে আসিয়া লাগিলে উহা বিষাক্ত হইয়া নানা রোগের সৃষ্টি করিতে পারে। সেইজন্য



৫৯। ব্যাণ্ডেজ করিবার কয়েকটি পদ্ধতি ও তাগা-বন্ধনী (ঝ)

প্রথম হইতেই সাবধান হওয়া প্রয়োজন। সামান্য কাটিলে ঐ স্থান ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া ও টিংচার আয়োডিনের প্রলেপ দিয়া পরে পরিষ্কার কাপড়ের লম্বা টুকরা দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। ইহাতে জীবাণুরোধ ও রক্তপড়া বন্ধ হয়। বেশী কাটিলে ও রক্ত পড়িলে প্রথমেই রক্তপাত বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। ক্ষতস্থানের উপর পরিষ্কার কাপড় ভাঁজ করিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া দিলে অনেক সময়ে রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া থাকে। সুবিধা থাকিলে বাধিবার আগেই

ঐস্থানে টিংচার আয়োডিনের প্রলেপ দিতে পারিলে ভাল হয়। ইহাতেও যদি রক্তপড়া বন্ধ না হয় তাহা হইলে কাটা জায়গার উপরে ও নীচে চাপিয়া ধরিয়া রাখিলে অনেক সময়ে সুফল পাওয়া যাইতে পারে (চিত্র ৫৯)। যদি ধমনী কাটিয়া ফিন্‌কি দিয়া রক্ত বাহির হয় তাহা হইলে ক্ষতের উপরের দিকে এবং শিরা কাটিলে নীচের দিকে চাপিয়া ধরিয়া ব্যাণ্ডেজ দিয়া তাগা-বন্ধনী দিলে রক্তপাত বন্ধ হইয়া যায় (চিত্র ৫৯); কিন্তু এই অবস্থায় বেশীক্ষণ রাখিলে রোগীর ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসককে খবর দেওয়া প্রয়োজন। রক্তপড়া বন্ধ হইলে তাগা-বন্ধনী খুলিয়া পরিষ্কার কাপড় দিয়া ঐস্থান সাধারণভাবে বাঁধিয়া অর্থাৎ ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিতে হইবে। কি করিয়া ব্যাণ্ডেজ করিতে হয় তাহার কয়েকটি প্রণালী ৫৯নং চিত্রে দেখান হইল।

৪। **জলে ডোবা ও কৃত্রিম শ্বাস-কার্য** (Drowning and artificial respiration)—জলে ডুবিলে লোকে শ্বাসবদ্ধ হইয়া মারা



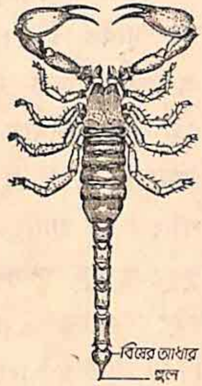
৬০। কৃত্রিম শ্বাস-কার্য

যায়। যতশীঘ্র সম্ভব জলমগ্ন ব্যক্তিকে জল হইতে উঠাইয়া ও উহার গলায় আঙ্গুল দিয়া মুখের ভিতরটা পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে।

তারপর উহার মাথা নীচু করিয়া পা দুইটিকে উপরের দিকে উঠাইয়া দেহটিকে ঝুলাইয়া রাখিলে ভিতরকার জল কিছুটা বাহির হইয়া আসিবে। কাপড়ের বাঁধন যদি কিছু থাকে তাহা খুলিয়া অথবা কাটিয়া দিয়া এই অবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-কার্যের ব্যবস্থা করিতে পারিলে জলমগ্ন ব্যক্তিকে অনেক সময়ে বাঁচান যায়। যে সকল উপায়ে কৃত্রিম শ্বাসকার্যের ব্যবস্থা করা যায় তাহাদের মধ্যে **শেফারের প্রণালী** অন্যতম (চিত্র ৬০)। ইহাতে রোগীকে মাটিতে উপুড় করিয়া শোয়াইতে হয় ও উহার বুকের নীচে একটি পাতলা বালিশ বা জামা জড়াইয়া রাখিয়া মাথাটিকে এমনভাবে রাখিতে হয় যাহাতে উহা একটু নীচু হইয়া পাশের দিকে বাঁকিয়া থাকে। এইবার কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-কার্য চালনা করা উচিত। প্রথমে একজনকে একপাশ হইয়া অথবা রোগীর উভয় পাশে পা রাখিয়া উহার মাথার দিকে মুখ করিয়া বসিতে হইবে। তারপর হাঁটু গাড়িয়া রোগীর শেষ পাঁজরার নীচের দিকে দুই হাত দিয়া একসঙ্গে জোরে চাপ দিয়া আগাইয়া যাইতে হইবে। হাত বুকের দিকে পাঁজরার শেষপ্রান্তে আসিলে প্রত্যেকবার হাত উঠাইয়া আবার শেষ পাঁজরার উপর আগেকার মত চাপ দিয়া নীচের দিকে হাতকে আগাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। প্রতি মিনিটে অন্ততঃ দশবার করিয়া এইভাবে আধঘণ্টা চালাইতে পারিলে রোগীর মুখ দিয়া বায়ু ও জল বাহির হইয়া আসিবে এবং পুনরায় শ্বাস-কার্য ও হৃদয়ের স্পন্দন আরম্ভ হইবে।

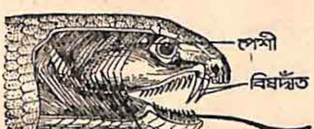
৫। **কাঁকড়া-বিছা কামড়ান** (Bite of scorpions)—কাঁকড়া-বিছা প্রকৃতপক্ষে কামড়ায় না ; ইহারা হুল ফোটায়। ইহাদের দেহের শেষাংশে হুলের মধ্যে একপ্রকার তীব্র বিষ থাকে। ঐ বিষ শরীরের কোন স্থানে লাগিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। প্রথমেই একটি

বড় চাবির গর্তের দ্বারা ঐ স্থান চাপিয়া ধরিতে হইবে। ইহাতে হুলটি উঠিয়া যাইবে এবং বিষও ছড়াইতে পারিবে না। তারপর ঐ স্থানে অ্যামোনিয়া, গরম জল, বরফ, চুন, কার্বলিক এসিড, কোকেন দ্রব প্রভৃতি যে কোন একটি লাগাইলে যন্ত্রণার উপশম হইতে পারে।



৬১। কাঁকড়া-বিছা

৬। **সর্পাঘাত** (Bite of snakes)—সাপ দুই প্রকারের পাওয়া যায়, যথা—বিষহীন ও বিষধর। বিষধর সাপের উপরের চোয়ালের মধ্যে দাঁতের সারির উপর বিষের থলি থাকে। থলির মুখটি সরু হইয়া বিষদাঁতের সহিত যুক্ত থাকে। সাপে কামড়াইলে ঐ থলি হইতে তরল বিষ দাঁতের গর্ত দিয়া বাহির হইয়া আসে ও শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। বিষধর সাপে কামড়াইলে উহার দুইটি দাঁতের দাগ স্পষ্ট দেখা যায়। সাপে কামড়াইলে ভয়ে অধীর হইতে নাই। ক্ষতস্থানের কিছু উপরে দড়ি অথবা কাপড় দিয়া দুই তিনটি শক্ত বাঁধন দিতে হইবে, ইহাতে রক্ত চলাচল করিতে পারিবে না ও বিষ শরীরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে না। ক্ষতস্থানের চারিপাশ অল্প গভীর করিয়া কাটিয়া দিলে রক্তের সহিত সাপের বিষের খানিকটা বাহির হইয়া আসিবে এবং বিলম্ব না করিয়া সত্বর ডাক্তার ডাকাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।



৬২। সাপের বিষদাঁত ও বিষের থলি

৭। **পাগলা কুকুরে কামড়ান** (Bite of rabid dogs) —পাগলা কুকুরের দংশন অত্যন্ত মারাত্মক। উহার লালাতে একপ্রকার জীবাণু থাকে; তাহার দ্বারা কুকুরে কামড়ান ব্যক্তির রক্ত দূষিত হইয়া **জলাতঙ্ক রোগ** দেখা দেয়। রোগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে সাধারণতঃ চার হইতে ছয় সপ্তাহ সময় লাগে। কোন কোন সময়ে তাহার আগেও লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে পারে। উহাদের মধ্যে প্রধান লক্ষণ হইল জল দেখিয়া ভয় পাওয়া। জলের পাত্র কাছে আনিলেই রোগী উত্তেজিত হইয়া পড়ে। জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত কুকুরের চক্ষু রক্তবর্ণ ও কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়, মুখ হইতে লালা নিঃসৃত হইতে থাকে এবং পিছনের পা দুইটি পড়িয়া যায়। এই রোগ দেখা দিবার আট দশ দিনের মধ্যেই কুকুরটি মারা পড়ে। কুকুর কামড়াইলে ঐ কুকুরের দেহে ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় কি না সে বিষয়ে অন্ততঃ দশদিন উহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া লক্ষ্য করা উচিত। প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে, কামড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থান ভাল করিয়া ধুইয়া উহাতে টিংচার আয়োডিন এবং কার্বলিক অ্যাসিড প্রভৃতি লাগাইতে হইবে। তারপর ভাল ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু প্রতিষেধক ঔষধ বাহির করিয়া মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ঐ ঔষধের ইন্‌জেক্‌সন দুই সপ্তাহ ধরিয়া লইলে কুকুরে দষ্ট ব্যক্তির শরীরে এমন একটি জিনিসের সৃষ্টি হয় যাহাতে জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু মারা পড়ে।

পরিশিষ্ট

প্রশ্নমালা

প্রথম অধ্যায়

১। বায়ুর উপাদানগুলির নাম কর। বায়ুর মধ্যে ইহাদের পরিমাণের মাত্রা কত?

২। বায়ুর মধ্যে যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে, তাহা কি কি পরীক্ষার দ্বারা জানিতে পারা যায়?

৩। অক্সিজেন না হইলে দহন-কার্য চলিতে পারে না, তাহা প্রমাণ কর।

৪। শ্বাস-কার্য, দহন ও মরিচা পড়ার তুলনা কর।

৫। বাস করিবার ঘর ও রান্নাঘরের বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা কিরূপে করিতে হয়?

৬। বায়ু হইতে কিরূপে শক্তি উৎপাদন করিতে পারা যায়?

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। দূষিত জল শোধন করিবার প্রণালী লিখ।

২। মিশ্র ও যৌগিক পদার্থ বলিতে কি বুঝ? কয়েকটি যৌগিক পদার্থের উদাহরণ দাও। মিশ্র ও যৌগিক পদার্থের তুলনা লিখ।

৩। বাতাস ও জলের উপাদানগুলির নাম কর। ইহাদের যে কোন তিনটি উপাদানের ধর্ম সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। দ্রাবক, দ্রাব ও দ্রবণ উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়া দাও। সংপৃক্ত দ্রব কাহাকে বলে? দ্রবণ ও মিশ্রণের তুলনা কর।

৫। বাতাসের আর্দ্রতা বলিতে কি বুঝ? বাতাসের সংপৃক্তি-মাত্রা কাহাকে বলে?

৬। শিশির ও কুয়াশা কিরূপে হইয়া থাকে? কুয়াশা ও মেঘে প্রভেদ নাই কেন?

৭। খরজল ও মৃদুজল বলিতে কি বুঝ? খরজলকে কিরূপে মৃদু করে?

৮। জলশক্তি সম্বন্ধে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখ।

তৃতীয় অধ্যায়

১। শক্তি কাহাকে বলে? শক্তির রূপান্তরের অর্থ কি? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। খাদ্যাভাবে কেন আমরা বাঁচিতে পারি না? সূর্যের সঙ্গে জীবের কি সম্বন্ধ?

৩। জীবযন্ত্র ও জড়যন্ত্রের তুলনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

১। তাপের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে?

২। জল গরম করিলে যে জলের আয়তন বাড়ে তাহা কিরূপে পরীক্ষা করিবে?

৩। থার্মমিটার কি ভাবে তৈয়ারী হয়? সেন্টিগ্রেড ও ফারেনহাইট স্কেলের তুলনা কর।

৪। তাপ সঞ্চারণ কি কি ভাবে হইতে পারে? এ বিষয়ে কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের পার্থক্য কি?

৫। পশমের পোশাক পরিলে গরম লাগে কেন?

পঞ্চম অধ্যায়

১। আলোক-বিকীর্ণ-শক্তি বলিতে কি বুঝ?

২। বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের সমতা কিরূপে বজায় থাকে?

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। কি কি লক্ষণ দেখিয়া জীবকে জড় হইতে আলাদা করা যায় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

সপ্তম অধ্যায়

১। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

অষ্টম অধ্যায়

১। জীবের শ্রেণীবিভাগের কেন প্রয়োজন হইয়া থাকে ?

২। জীবের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে কি জান ?

৩। মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী কাহাকে বলে ? প্রাণীদিগের শ্রেণীবিভাগ কিরূপে করা হয় ?

নবম অধ্যায়

১। মটরগাছের দেহে কি কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে ?

২। একটি মটর ফুলের বিস্তারিত বিবরণ দাও।

৩। মটরগাছের মূল, কাণ্ড, পাতা ও ফুলের কাজ সম্বন্ধে কি জান ?

দশম অধ্যায়

১। ঈস্টের দেহকোষের বর্ণনা দাও। কিরূপে উহার কোরকোদ্গম হইয়া থাকে ?

২। মসের দেহের বর্ণনা দাও। উহা কিরূপে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে ?

৩। অ্যামিবার দেহকোষের বর্ণনা দাও। উহা কিরূপে খাদ্য সংগ্রহ করে ?

একাদশ অধ্যায়

১। কোষ ও কলা কাহাকে বলে ? মানবদেহের মূল উপাদানগুলির সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ।

২। নরকঙ্কালে কয়টি হাড় আছে ? কঙ্কাল মানবদেহের কি কাজে লাগে ? উহার বিভিন্ন অংশের নাম কর।

৩। রক্ত ও লসিকা কাহাকে বলে ? উহাদের উপাদানগুলির নাম কর।

৪। মুখগহ্বরে কয়টি দাঁত আছে ? দাঁত কয়প্রকারের হইয়া থাকে ?

৫। শ্বাসকার্য কিরূপে হইয়া থাকে ?

৬। পৌষ্টিকনালীর মধ্যে খাদ্য কিরূপে হজম হয় ?

৭। রেচন-তন্ত্রের বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৮। করোটি, চর্ম, পেশী, নার্ভ, জারক রস, পৌষ্টিকনালী প্রভৃতির মধ্যে যে কোন তিনটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখ।

দ্বাদশ অধ্যায়

১। ম্যালেরিয়া কেন হয় ? এই রোগ হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায় ?

২। কিরূপে কলেরা ও বসন্তের বিস্তৃতি হইয়া থাকে ?

৩। খোস-পাঁচড়ার কারণ কি ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। আগুনে পুড়িলে তাহার জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে কি করা কর্তব্য ?

২। কৃত্রিম শ্বাস-কার্য কাহাকে বলে ? শেফারের প্রণালী বর্ণনা কর।

৩। হাড় ভাঙ্গিলে অথবা কাটিয়া রক্তপাত হইলে কি ব্যবস্থা করিবে ?

৪। বিষধর সাপে কামড়াইয়াছে তাহা কিরূপে বুঝা যায় ?

৫। পাগলা কুকুরে কামড়াইলে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায় ? ইহার প্রতিষেধক ব্যবস্থা কি ?

৬। কাঁকড়া-বিছা কামড়াইলে কিরূপে যন্ত্রণার লাঘব হইতে পারে ?